পরিণীতা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



পরিণীতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যূষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পোঁছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।

গুরুচরণ ষাট টাকা বেতনের ব্যাঙ্কের কেরানী। সুতরাং দেহটিও যেমন ঠিকাগাড়ির ঘোড়ার মত শুষ্ক শীর্ণ, চোখেমুখেও তেমনি তাহাদেরি মত একটা নিষ্কাম নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব। তথাপি এই ভয়ঙ্কর শুভ-সংবাদে আজ তাঁহার হাতের হুঁকাটা, হাতেই রহিল, তিনি জীর্ণ পৈতৃক তাকিয়াটা ঠেস দিয়া বসিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবারও আর তাঁহার জোর রহিল না।

শুভ-সংবাদ বহিয়া আনিয়াছিল তাঁহার তৃতীয় কন্যা দশমবর্ষীয়া আন্নাকালী। সে বলিল, বাবা, চল না দেখবে।

গুরুচরণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা, এক গেলাস জল আন ত খাই।

মেয়ে জল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে, গুরুচরণের সর্বাগ্রে মনে পড়িল সূতিকাগৃহের রকমারি খরচের কথা। তার পরে, ভিড়ের দিনে স্টেশনে গাড়ি আসিলে দোর খোলা পাইলে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা পোঁটলা-পোঁটলি লইয়া পাগলের মত যেভাবে লোকজনকে দলিত পিষ্ট করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিতে থাকে, তেমনি মার-মার শব্দ করিয়া তাঁহার মগজের মধ্যে দুশ্চিন্তারাশি হু হু করিয়া ঢুকিতে লাগিল। মনে পড়িল, গত বৎসর তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার শুভ-বিবাহে বৌবাজারের এই দ্বিতল ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়িয়াছে এবং তাহারও ছয় মাসের সুদ বাকী। দুর্গাপূজার আর মাসখানেক মাত্র বিলম্ব আছে—মেজমেয়ের ওখানে

তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। অফিসে কাল রাত্রি আটটা পর্যন্ত ডেবিট ক্রেডিট মিলে নাই, আজ বেলা বারোটার মধ্যে বিলাতে হিসাব পাঠাইতে হইবে। কাল বড়সাহেব হুকুম জারি করিয়াছেন, ময়লা বস্ত্র পরিয়া কেহ অফিসে ঢুকিতে পারিবে না, ফাইন হইবে, অথচ গত সপ্তাহ হইতে রজকের সন্ধান মিলিতেছে না, সংসারের অর্ধেক কাপড়-চোপড় লইয়া সে বোধ করি নিরুদ্দেশ। গুরুচরণ আর ঠেস দিয়া থাকিতেও পারিলেন না, হুঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই কলিকাতা শহরে প্রতিদিন কত লোক গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িয়া অপঘাতে মরে, তারা কি আমার চেয়েও তোমার পায়ে বেশি অপরাধী! দয়াময়! তোমার দয়ায় একটা ভারী মোটরগাড়ি যদি বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়!

আন্নাকালী জল আনিয়া বলিল, বাবা ওঠ, জল এনেছি।

গুরুচরণ উঠিয়া সমস্তটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আঃ, যা মা, গেলাসটা নিয়ে যা।

সে চলিয়া গেলে গুরুচরণ আবার শুইয়া পড়িলেন।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মামা, চা এনেছি ওঠ।

চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার অর্ধেক জ্বালা যেন নিবিয়া গেল, বলিলেন, সারারাত জেগে আছিস মা, আয় আমার কাছে এসে একবার বোস।

ললিতা সলজ্জহাস্যে কাছে বসিয়া বলিল, আমি রাত্তিরে জাগিনি মামা।

এই জীর্ণ শীর্ণ গুরুভারগ্রস্ত অকালবৃদ্ধ মাতুলের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুগভীর ব্যথাটা তার চেয়ে বেশী এ সংসারে আর কেহ

অনুভব করিত না।

গুরুচরণ বলিলেন, তা হোক, আয়, আমার কাছে আয়।

ললিতা কাছে আসিয়া বসিতেই গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত দিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, আমার এই মাটিকে যদি রাজার ঘরে দিতে পারতুম, তবেই জানতুম একটা কাজ কল্লুম।

ললিতা মাথা হেঁট করিয়া চা ঢালিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হাঁ মা, তোর দুঃখী মামার ঘরে এসে দিনরাত্রি খাটতে হয়, না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, দিবারাত্রি খাটতে হবে কেন মামা? সবাই কাজ করে, আমিও করি।

এইবার গুরুচরণ হাসিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন, হাঁ ললিতা, আজ তবে রান্নাবান্নার কি হবে মা?

ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন মামা, আমি রাঁধব যে!

গুরুচরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই রাঁধবি কি মা, রাঁধতে কি তুই জানিস?

জানি মামা। আমি মামীমার কাছে সব শিখে নিয়েছি।

গুরুচরণ চায়ের বাটিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিলেন, সত্যি?

সত্যি! মামীমা দেখিয়ে দেন,—আমি কতদিন রাঁধি যে। বলিয়াই মুখ নীচু করিল।

তাহার আনত মাথার উপর হাত রাখিয়া গুরুচরণ নিঃশব্দে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার একটা গুরুতর দুর্ভাবনা দূর হইল।

এই ঘরটি গলির উপরেই। চা পান করিতে করিতে জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় গুরুচরণ চেঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিলেন, শেখর নাকি? শোন, শোন।

একজন দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা ঘরে প্রবেশ করিল।

গুরুচরন বলিলেন, বসো, আজ সকালে তোমার খুড়ীমার কাণ্ডটা শুনেচ বোধ হয়।

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, কাণ্ড আর কি, মেয়ে হয়েছে তাই?

গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি ত বলবে তাই, কিন্তু তাই যে কি সে শুধু আমিই জানি যে!

শেখর কহিল, ও-রকম বলবেন না কাকা, খুড়ীমা শুনলে বড় কষ্ট পাবেন। তা ছাড়া ভগবান যাকে পাঠিয়েছেন তাকে আদর-আহ্লাদ করে ডেকে নেওয়া উচিত।

গুরুচরণ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আদর-আহ্লাদ করা উচিত, সে আমিও জানি! কিন্তু বাবা, ভগবানও ত সুবিচার করেন না। আমি গরীব, আমার ঘরে এত কেন? এই বাড়িটুকু পর্যন্ত তোমার বাপের কাছে বাঁধা পড়েচে, তা পড়ুক, সে জন্য দুঃখ করিনে শেখর, কিন্তু এই হাতে-হাতেই দেখ না বাবা, এই যে আমার ললিতা, মা বাপ-মরা সোনার পুতুল, একে শুধু রাজার ঘরেই মানায়।

কি করে একে প্রাণ ধরে যার-তার হাতে তুলে দিই বল ত? রাজার মুকুটে যে কোহিনুর জ্বলে, তেমনি কোহিনুর রাশীকৃত করে আমার এই মা'টিকে ওজন করলেও দাম হয় না। কিন্তু কে তা বুঝবে! পয়সার অভাবে এমন রত্নকেও আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে। বল দেখি বাবা, সে-সময়ে কি রকম শেল বুকে বাজবে? তেরো বছর বয়স হলো, কিন্তু হাতে আমার এমন তেরোটা পয়সা নেই যে, একটা সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থির করি।

গুরুচরণের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেখর চুপ করিয়া রহিল।

গুরুচরণ পুনরায় কহিলেন, শেখরনাথ, দেখো ত বাবা, তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যদি এই মেয়েটার কোন গতি করে দিতে পার। আজকাল অনেক ছেলে শুনেচি টাকাকড়ির দিকে চেয়ে দেখে না, শুধু মেয়ে দেখেই পছন্দ করে। তেমনি যদি দৈবাৎ একটা মিলে যায় শেখর, তা হলে বলচি আমি, আমার আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে। আর কি বলব বাবা, এ পাড়ায় তোমাদের আশ্রয়ে আমি আছি, তোমার বাবা আমাকে ছোট ভায়ের মতই দেখেন।

শেখর মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা তা দেখব।

গুরুচরণ বলিলেন, ভুলো না বাবা, দেখো। ললিতা ত আট বছর বয়স থেকে তোমাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তুমি ত দেখতে পাচ্ছ ও কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন শিষ্ট শান্ত। একফোঁটা মেয়ে, আজ থেকে ও-ই আমাদের রাঁধাবাড়া করবে, দেবে-থোবে, সমস্তই এখন ওর মাথায়।

এই সময়ে ললিতা একটিবার চোখ তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। তাহার ওষ্ঠাধরের উভয় প্রান্ত ঈষৎ প্রসারিত হইল মাত্র। গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ওর বাপই কি কিছু কম রোজগার করেচে, কিন্তু সমস্তই এমন করে দান করে গেল যে, এই একটা মেয়ের জন্যেও কিছু রেখে গেল না।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন, আর রেখে গেল না-ই বা বলি কি করে? সে যত লোকের যত দুঃখ ঘুচিয়েছে, তার সমস্ত ফলটুকুই আমার এই মা'টিকে দিয়ে গেছে, তা নইলে কি এতটুকু মেয়ে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে! তুমিই বল না শেখর, সত্য কি না?

শেখর হাসিতে লাগিল। জবাব দিল না।

সে উঠিবার উপক্রম করিতেই গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, এমন সকালেই কোথা যাচ্চ?

শেখর বলিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি—একটা কেস আছে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুরুচরণ আর একবার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, কথাটা একটু মনে রেখো বাবা! ও একটু শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু চোখমুখ, এমন হাসি, এত দয়ামায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।

শেখর মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। এই ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এম. এ. পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল, গত বৎসর হইতে এটর্নি হইয়াছে। তাহার পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবারে লক্ষপতি

হইয়া কয়েক বৎসর হইতে ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন, বড় ছেলে অবিনাশ উকিল,—ছোট ছেলে এই শেখরনাথ।

তাঁহার প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি পাড়ার মাথায় উঠিয়াছিল এবং ইহার একটা খোলা ছাদের সহিত গুরুচরণের ছাদটা মিশিয়া থাকায় উভয় পরিবারে অত্যন্ত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বাড়ির মেয়েরা এই পথেই যাতায়াত করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবাজারের এক বড়লোকের ঘরে বহুদিন হইতেই শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। সেদিন তাঁহারা দেখিতে আসিয়া আগামী মাঘের কোন একটা শুভদিন স্থির করিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শেখরের জননী স্বীকার করিলেন না। ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ছেলে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিলে তবে বিবাহ দিব।

নবীন রায়ের চোখ ছিল শুধু টাকার দিকে, তিনি গৃহিণীর এই গোলমেলে কথায় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এ আবার কি কথা! মেয়ে ত দেখাই আছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাক, তার পরে আশীর্বাদ করার দিন ভাল করে দেখলেই হবে।

তথাপি গৃহিণী সম্মত হইলেন না, পাকা কথা কহিতে দিলেন না। নবীন রায় সেদিন রাগ করিয়া অনেক বেলায় আহার করিলেন এবং দিবানিদ্রাটা বাহিরের ঘরেই দিলেন।

শেখরনাথ লোকটা কিছু শৌখিন। সে তেতলায় যে ঘরটিতে থাকে, সেটি অতিশয় সুসজ্জিত। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্ণবেলায় সে সেই ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়ে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ললিতা ঘরে ঢুকিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌ দেখতে যাবে, না?

শেখর ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে! কৈ বেশ করে সাজিয়ে দাও দেখি, বৌ যাতে পছন্দ করে।

ললিতা হাসিল। বলিল, এখন ত আমার সময় নেই শেখরদা—আমি টাকা নিতে এসেচি, বলিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া একটা দেরাজ খুলিয়া

গণিয়া গণিয়া গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিল, টাকা ত দরকার হলেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ শোধ হবে কি করে?

শেখর চুলের একপাশ বুরুশ দিয়া সযত্নে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোধ হবে, না হচ্ছে!

ললিতা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

শেখর বলিল, চেয়ে রইলে, বুঝতে পারলে না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আরও একটু বড় হও, তখন বুঝতে পারবে, বলিয়া শেখর জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শেখর একটা কোচের উপর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মা একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, মেয়ে কি রকম দেখে এলি রে?

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ।

শেখরের মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু এমনি সুন্দর তাঁহার দেহের বাঁধন যে দেখিলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক মনে হইত না। আবার এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃহৃদয়টি ছিল, তাহা আরও নবীন আরও কোমল। তিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়া সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শহরের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্য বেমানান দেখায় নাই। শহরের চাঞ্চল্যসজীবতা এবং আচার-ব্যবহারও যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, জন্মভূমির নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মাধুর্যও তেমনি হারাইয়া ফেলেন নাই।

এই মা'টি যে শেখরের কত বড় গর্বের বস্তু ছিল, সে-কথা তাহার মা-ও জানিতেন না। জগদীশ্বর শেখরকে অনেক বস্তু দিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য,

রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি—কিন্তু এই জননীর সন্তান হইতে পারার ভাগ্যটাকেই সে কায়মনে ভগবানের সবচেয়ে বড় দান বলিয়া মনে করিত।

মা বলিলেন, 'বেশ' বলে চুপ করে রইলি যে রে!

শেখর আবার হাসিয়া মুখ নিচু করিয়া বলিল, যা জিজ্ঞেস করলে তাই ত বললুম।

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, কৈ বললি? রঙ কেমন, ফরসা? কার মত হবে? আমাদের ললিতার মত?

শেখর মুখ তুলিয়া বলিল, ললিতা ত কালো মা, ওর চেয়ে ফরসা।

মুখচোখ কেমন?

তাও মন্দ নয়।

তবে কর্তাকে বলি?

এবার শেখর চুপ করিয়া রহিল।

মা ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, হাঁ রে, মেয়েটি লেখাপড়া শিখেচে কেমন?

শেখর বলিল, সে ত জিজ্ঞাসা করিনি মা!

অতিশয় আশ্চর্য হইয়া মা বলিলেন, জিজ্ঞেস করিসনি কি রে! যেটা আজকাল তোদের সবচেয়ে দরকারী জিনিস, সেইটেই জেনে আসিসনি?

শেখর হাসিয়া বলিল, না মা, ওকথা আমার মনেই ছিল না।

ছেলের কথা শুনিয়া এবার তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে তুই ওখানে বিয়ে করবি নে দেখচি!

শেখর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় ললিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ললিতা ধীরে ধীরে ভুবনেশ্বরীর পিছনে আসিয়া

দাঁড়াইল। তিনি বাঁ হাত দিয়া তাহাকে সুমুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি মা?

ললিতা চুপি চুপি বলিল, কিচ্ছু না মা।

ললিতা পূর্বে ইঁহাকে মাসীমা বলিত, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোর আমি ত মাসী হইনে ললিতে,মা হই। তখন হইতে সে মা বলিয়া ডাকিত। ভুবনেশ্বরী তাহাকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন,কিচ্ছু না? তবে বুঝি আমাকে শুধু একবার দেখতে এসেছিস?

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

শেখর কহিল, দেখতে এসেচে, রাঁধবে কখন?

মা বলিলেন, রাঁধবে কেন?

শেখর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তবে ওদের রাঁধবে মা? ওর মামাও ত সেদিন বললেন, ললিতাই রাঁধাবাড়া সব কাজ করবে।

মা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ওর মামার কি, যা হোক একটা বললেই হলো। ওর বিয়ে হয়নি, ওর হাতে খাবে কে? আমাদের বামুনঠাকরুনকে পাঠিয়ে দিয়েচি, তিনি রাঁধবেন। বড়বৌমা আমাদের রান্নাবান্না করচেন—আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতেই আজকাল খাই।

শেখর বুঝিল, মা এই দুঃখী পরিবারের গুরুভার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর শেখর নিজের ঘরে কোচের উপর কাত হইয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া শব্দ-সাড়া করিয়া দেরাজ খুলিতে লাগিল। শেখর বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি?

ললিতা বলিল, টাকা নিচ্চি।

হুঁ, বলিয়া শেখর পড়িতে লাগিল। ললিতা আঁচলে টাকা বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সে সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা শেখর চাহিয়া দেখে। কহিল, দশ টাকা নিলুম শেখরদা।

শেখর 'আচ্ছা' বলিল, কিন্তু চাহিয়া দেখিল না। অগত্যা সে এটা-ওটা নাড়িতে লাগিল, মিছামিছি দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না, তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেলেই ত চলে না, আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইতে হইল। আজ তাহারা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।

শেখরের বিনা হুকুমে সে যে কোথাও যাইতে পারে না, ইহা সে জানিত। কেহই তাহাকে ইহা বলিয়া দেয় নাই, কিংবা কেন, কি জন্য, এ-সব তর্কও কোনদিন মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবমাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল; অপরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে খুশি যাইতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামীর অনুমতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমরা যে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।

তাহার মৃদুকণ্ঠ শেখরের কানে গেল না—সে জবাব দিল না।

ললিতা তখন আরো একটু গলা চড়াইয়া বলিল, সবাই আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েচে যে।

এবার শেখর শুনিতে পাইল, বইখানা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

ললিতা একটুখানি রুষ্টভাবে বলিল, এতক্ষণে বুঝি কানে গেল। আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি যে।

শেখর বলিল, আমরা কারা?

আমি, আন্নাকালী, চারুবালা, তার মামা।

মামাটি কে?

ললিতা বলিল, তাঁর নাম গিরীনবাবু। পাঁচ-ছ'দিন হলো মুঙ্গেরের বাড়ি থেকে এসেচেন, এখানে বি. এ. পড়বেন—বেশ লোক সে—

বাঃ—নাম, ধাম, পেশা—এ যে দিব্যি আলাপ হয়ে গেছে দেখচি। তাতেই চার-পাঁচ দিন মাথার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি—তাস খেলা হচ্ছিল বোধ করি?

হঠাৎ শেখরের কথা বলার ধরন দেখিয়া ললিতা ভয় পাইয়া গেল। সে মনেও করে নাই, এরূপ একটা প্রশ্নও উঠিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল।

শেখর বলিল, এ ক'দিন খুব তাস চলছিল, না?

ললিতা ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, চারু বললে যে।

চারু বললে? কি বললে? বলিয়া শেখর মাথা তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, একেবারে কাপড় পরে তৈরি হয়ে আসা হয়েছে,—আচ্ছা যাও।

ললিতা গেল না, সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের বাড়ির চারুবালা তাহার সমবয়সী এবং সই। তাহারা ব্রাহ্ম। শেখর ঐ গিরীনকে ছাড়া তাহাদের সকলকেই চিনিত। গিরীন পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বে কিছুদিনের জন্য একবার এদিকে আসিয়াছিল। এতদিন বাঁকিপুরে পড়িত, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই, আসেও নাই। তাই শেখর তাহাকে চিনিত না। ললিতা তথাপি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, মিছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও। বলিয়া মুখের সমুখেই বই তুলিয়া লইল।

মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া থাকার পরে ললিতা আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, যাব?

যেতেই ত বললুম, ললিতা।

শেখরের ভাব দেখিয়া ললিতার থিয়েটার দেখিবার সাধ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার না গেলেও যে নয়।

কথা হইয়াছিল, সে অর্ধেক খরচ দিবে এবং চারুর মামা অর্ধেক দিবে।

চারুদের ওখানে সকলেই তাহার জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং যত বিলম্ব হইতেছে তাহাদের অধৈর্যও তত বাড়িতেছে, ইহা সে চোখের উপর দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। অনুমতি না পাইয়া যাইবে এত সাহস তাহার ছিল না। আবার মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটি—যাব?

শেখর বইটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া ধমকাইয়া উঠিল, বিরক্ত করো না ললিতা, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, ভালমন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েচে।

ললিতা চমকিয়া উঠিল। শেখরের কাছে বকুনি খাওয়া তাহার নূতন নহে; অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু দু-তিন বৎসরের মধ্যে এরকম শুনে নাই। ওদিকে বন্ধুরা অপেক্ষা করিয়া আছে, সেও কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইতিমধ্যে টাকা আনিতে আসিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের কাছেই বা সে কি বলিবে?

কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তাহার শেখরের তরফ হইতে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেই জোরেই সে একেবারে কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু যে সেই স্বাধীনতাই এমন রূঢ়ভাবে খর্ব হইয়া গেল তাহা নহে, যেজন্য হইল সে কারণটা যে কতবড় লজ্জার, তাহাই আজ তাহার তেরো বছর বয়সে প্রথম উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া সে আরো মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া ঝিকে দিয়া আন্নাকালীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া কহিল, তোরা আজ যা কালী, আমার বড় অসুখ কচ্চে, সইকে বল গে আমি যেতে পারব না।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ সেজদি?

মাথা ধরেচে, গা বমি-বমি কচ্চে—ভারী অসুখ কচ্চে, বলিয়া সে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল। তারপর চারু আসিয়া সাধাসাধি করিল, পীড়াপীড়ি করিল,

মামীকে দিয়া সুপারিশ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজি করিতে পারিল না। আন্নাকালী হাতে দশটা টাকা পাইয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতেছিল। পাছে এই-সব হাঙ্গামায় পড়িয়া যাওয়া না ঘটে, এই ভয়ে সে চারুকে আড়ালে ডাকিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, সেজদির অসুখ কচ্চে—সে নাই গেল চারুদি! আমাকে টাকা দিয়েছে, এই দ্যাখো—আমরা যাই চল। চারু বুঝিল, আন্নাকালী বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে কাহারো খাটো নয়। সে সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুবালার মা মনোরমার তাস খেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু সংসারে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খেলার ঝোঁক যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। তাঁহার এই ত্রুটি শুধরাইয়া যাইত ললিতাকে পাইলে। সে খুব ভাল খেলিতে পারিত। মনোরমার মামাত ভাই গিরীন্দ্র আসা পর্যন্ত এ-কয়দিন সমস্ত দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে তাসের বিরাট আড্ডা বসিতেছিল। গিরীন পুরুষমানুষ, খেলে ভাল, সুতরাং তার বিপক্ষে বসিতে গেলে মনোরমার ললিতাকে চাই-ই।

থিয়েটার দেখার পরের দিন যথাসময়ে ললিতা উপস্থিত হইল না দেখিয়া মনোরমা ঝিকে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতা তখন একটি মোটা খাতায় একখানা ইংরাজী বই হইতে বাংলা তর্জমা করিতেছিল, গেল না।

তাহার সই আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না, তখন মনোরমা নিজে আসিয়া তাহার খাতাপত্র একদিকে টান মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, নে, ওঠ। বড় হয়ে তোকে জজিয়তি করতে হবে না, বরং তাস খেলতেই হবে—চল।

ললিতা মনে মনে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া, কাঁদ-কাঁদ হইয়া জানাইল, আজ তাহার কিছুতেই যাবার জো নাই, বরং কাল যাইবে। মনোরমা কিছুতেই শুনিলেন না, অবশেষে মামীকে জানাইয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; সুতরাং তাহাকে আজও গিয়া গিরীনের বিপক্ষে বসিয়া তাস খেলিতে হইল। কিন্তু, খেলা জমিল না। এদিকে সে এতটুকু মন দিতে পারিল না। সমস্ত সময়টা আড় হইয়া রহিল এবং বেলা না পড়িতেই উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় গিরীন বলিল, রাত্রে আপনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু গেলেন না, কাল আবার যাই চলুন।

ললিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, আমার বড় অসুখ করেছিল।

গিরীন হাসিয়া বলিল, এখন ত অসুখ সেরেচে, চলুন কাল যেতে হবে।

না না, কাল আমার সময় হবে না, বলিয়া ললিতা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ শধু যে শেখরের ভয়ে তাহার খেলায় মন লাগে নাই তাহা নহে, তাহার নিজেরও ভারী লজ্জা করিতেছিল।

শেখরের বাটীর মত, এই বাটীতেও সে ছেলেবেলা হইতে আসা-যাওয়া করিয়াছে এবং ঘরের লোকের মতই সকলের সুমুখে বাহির হইয়াছে। তাই চারুর মামার সুমুখেও বাহির হইতে, কথা বলিতে, প্রথম হইতেই তাহার কোনও দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু, আজ গিরীনের সুমুখে বসিয়া সমস্ত খেলার সময়টা কেমন করিয়া যেন তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, এই কয়েকদিনের পরিচয়েই গিরীন্দ্র তাহাকে একটু বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেছে। পুরুষের প্রীতির চক্ষু যে এতবড় লজ্জার বস্তু তাহা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করে নাই।

বাড়িতে একবার দেখা দিয়াই সে তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে শেখরের ঘরে গিয়া ঢুকিল, এবং একেবারে কাজে লাগিয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে এ ঘরের ছোটখাটো কাজগুলি তাহাকেই করিতে হইত। বই প্রভৃতি গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, টেবিল সাজাইয়া দেওয়া, দোয়াত-কলম ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখা, এ-সমস্ত সে না করিলে আর কেহ করিত না।

ছয়-সাত দিনের অবহেলায় অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত ত্রুটি শেখরের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

ললিতা সময় পাইলেই কাছে কাছে থাকিত এবং সে নিজে কাহাকেও পর মনে করিত না বলিয়া এ-বাড়িতে তাহাকেও কেহ পর মনে করিত না। আট বছর বয়সে মা-বাপ হারাইয়া মামার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতে সে ছোটবোনটির মত শেখরের আশেপাশে ঘুরিয়া তাহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে।

সে যে শেখরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী তাহা সবাই জানিত, শুধু সেই স্নেহ যে এখন কোথায় উঠিয়াছে তাহাই কেহ জানিত না, ললিতাও না। শিশুকাল হইতে শেখরের কাছে তাহাকে একইভাবে এত অপর্যাপ্ত আদর পাইতে সবাই দেখিয়া আসিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তাহার কোন আদরই কাহারই চোখে বিসদৃশ বোধ হয় না, কিংবা কোন ব্যবহারই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। করে না বলিয়াই সে যে কোনও দিন বধূরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে সম্ভাবনাও কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ললিতাদের বাড়িতেও হয় নাই, ভুবনেশ্বরীর মনেও হয় নাই।

ললিতা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, কাজ শেষ করিয়া শেখর আসিবার পূর্বেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া ঘড়ির দিকে নজর করে নাই। হঠাৎ দ্বারের বাহিরে জুতার মসমস শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

শেখর ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এই যে! কাল তা হলে ফিরতে কত রাত হ'ল?

ললিতা জবাব দিল না।

শেখর একটা গদিআঁটা আরাম-চৌকির উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, ফেরা হ'ল কখন? দুটো? তিনটে? মুখে কথা নেই কেন?

ললিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর বিরক্ত হইয়া বলিল, নীচে যাও, মা ডাকছেন।

ভুবনেশ্বরী ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া জলখাবার সাজাইতেছিলেন, ললিতা কাছে আসিয়া বলিল, ডাকছিলে মা?

কৈ ডাকিনি ত, বলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়াই বলিলেন, মুখখানি এমন শুকনো কেন ললিতে? কিছু খাসনি বুঝি এখনো?

ললিতা ঘাড় নাড়িল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, আচ্ছা, যা তোর দাদাকে খাবার দিয়ে আমার কাছে আয়।

ললিতা খাবার হাতে করিয়া খানিক পরে, উপরে আসিয়া দেখিল, তখনো শেখর তেমনিভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, অফিসের পোশাকও ছাড়ে নাই, হাতমুখও ধোয় নাই। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, খাবার এনেচি।

শেখর চাহিয়া দেখিল না। বলিল, কোথাও রেখে দিয়ে যাও।

ললিতা রাখিয়া দিল না, হাতে করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর না চাহিয়াও বুঝিতেছিল, ললিতা যায় নাই—দাঁড়াইয়া আছে।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ললিতা, আমার দেরি আছে, রেখে নীচে যাও।

ললিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে রাগিতেছিল, মৃদুস্বরে বলিল, থাক দেরি, আমারো নীচে কোন কাজ নেই।

শেখর চোখ চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে কথা বেরিয়েছে। নীচে কাজ না থাকে ও-বাড়িতে আছে ত? তাও না থাকে, তার পরের বাড়িতেও আছে ত? বাড়ি ত তোমার একটি নয় ললিতে?

নয়ই ত! বলিয়া রাগ করিয়া ললিতা খাবারের থালাটা দুম করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, সন্ধ্যের পরে একবার এসো।

এক শ-বার আমি ওপর-নীচে করতে পারিনে, বলিয়া ললিতা চলিয়া গেল।

নীচে আসিবামাত্রই মা বলিলেন, দাদাকে তোর খাবার দিয়ে এলি, পান দিয়ে এলিনে রে!

আমার ক্ষীদে পেয়েচে মা, আমি আর পারিনে, আর কেউ দিয়ে আসুক, বলিয়া ললিতা বসিয়া পড়িল।

মা তাহার রুষ্ট মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুই খেতে ব'স, ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

ললিতা প্রত্যুত্তর না করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

সে থিয়েটার দেখিতে যায় নাই—তবুও শেখর তাহাকে বকিয়াছিল, এই রাগে সে চার-পাঁচ দিন শেখরকে দেখা দেয় নাই, অথচ সে অফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলা গিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিত। শেখর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দু'দিন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তথাপি সে যায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ পাড়ার একজন অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত, তাহার উপর ললিতার বড় দয়া ছিল, আসিলেই তাহাকে একটি করিয়া টাকা দিত। টাকাটি হাতে পাইয়া সে যে-সমস্ত অপূর্ব এবং অসম্ভব আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতে থাকিত, সেইগুলি শুনিতে সে অতিশয় ভালবাসিত। সে বলিত, ললিতা পূর্বজন্মে তাহার আপনার মা ছিল, এবং ইহা সে ললিতাকে দেখিবামাত্রই কেমন করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সেই বুড়া ছেলেটি তাহার আজ সকালেই দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, আমার মা-জননী কোথায় গো?

সন্তানের আহ্বানে আজ ললিতা কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন শেখর ঘরে আছে, সে টাকা আনিতে যায় কিরূপে? এদিক-সেদিক চাহিয়া মামীর কাছে গেল। মামী এইমাত্র ঝির সহিত বকাবকি করিয়া বিরক্ত-মুখে রাঁধিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিছু না বলিতে পারিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ভিক্ষুক দোরগোড়ায় লাঠিটি ঠেস দিয়া রাখিয়া বেশ চাপিয়া বসিয়াছে। ইতিপূর্বে ললিতা কখনও তাহাকে নিরাশ করে নাই, আজ শুধুহাতে ফিরাইয়া দিতে তাহার মন সরিল না।

ভিক্ষুক আবার ডাক দিল।

আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেজদি, তোমার সেই ছেলে এসেচে।

ললিতা বলিল, কালী, একটা কাজ কর না ভাই। আমার হাতজোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে শেখরদার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে আয়।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল, খানিক পরে তেমনি ছুটিয়া আসিয়া ললিতার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, এই নাও।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, শেখরদা কি বললে রে?

কিছু না। আমাকে বললে চাপকানের পকেট থেকে টাকা নিতে, আর নিয়ে এলুম।

আর কিছু বললে না?

না, আর কিচ্ছু না, বলিয়া আন্নাকালী ঘাড় নাড়িয়া খেলা করিতে চলিয়া গেল।

ললিতা ভিক্ষুক বিদায় করিল; কিন্তু অন্যদিনের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বাক্যচ্ছটা শুনিতে পারিল না—ভালই লাগিল না।

এ কয়দিন তাহাদের আড্ডা পূর্ণ তেজে চলিতেছিল। আজ দুপুরবেলা ললিতা গেল না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া রহিল। আজ সত্য সত্যই তাহার ভারী মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বিকালবেলা কালীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, কালী, তুই পড়া বলে নিতে শেখরদার ঘরে আর যাসনে?

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ যাই ত।

আমার কথা শেখরদা জিজ্ঞেস করে না?

না। হাঁ, হাঁ, পরশু করেছিল—তুমি দুপুরবেলা তাস খেল কিনা?

ললিতা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, তুই কি বললি?

কালী বলিল, তুমি দুপুরবেলা চারুদিদিদের বাড়ি তাস খেলতে যাও, তাই বললুম।

শেখরদা বললে, কে কে খেলে? আমি বললুম, তুমি আর সই-মা, চারুদিদি আর তার মামা। আচ্ছা, তুমি ভাল খেলো, না চারুদিদির মামা ভাল খেলে সেজদি? সই-মা বলে তুমি ভাল খেলো, না?

ললিতা সে কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই অত কথা বলতে গেলি কেন? সব কথায় তোর কথা কওয়া চাই, আর কোনদিন তোকে আমি কিচ্ছু দেব না, বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কালী অবাক হইয়া গেল। তাহার এই আকস্মিক ভাবপরিবর্তনের হেতু সে কিছুই বুঝিল না।

মনোরমার তাস খেলা দু'দিন বন্ধ হইয়াছে—ললিতা আসে না। তাহাকে দেখিয়া অবধি গিরীন্দ্র যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রথম হইতেই মনোরমা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সন্দেহ আজ সুদৃঢ় হইল।

এই দুইদিন গিরীন কি একরকম উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল। অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইত না, যখন-তখন বাড়ির ভিতরে আসিয়া এঘর-ওঘর করিত, আজ দুপুরবেলা আসিয়া বলিল, দিদি, আজও খেলা হবে না?

মনোরমা বলিলেন, কি করে হবে গিরীন, লোক কৈ? না হয়, আয় আমরা তিনজনেই খেলি।

গিরীন নিরুৎসাহভাবে বলিল, তিনজনে কি খেলা হয় দিদি? ও-বাড়ির ললিতাকে একবার ডাকতে পাঠাও না।

সে আসবে না।

গিরীন বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন আসবে না, ওদের বাড়িতে মানা করে দিয়েচে বোধ হয়, না?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, ওর মামা-মামী সে-রকম মানুষ নয়—সে নিজেই আসে না।

গিরীন হঠাৎ খুশি হইয়া বলিল, তা হলে তুমি নিজে আজ একবার গেলেই আসবেন—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে নিজের মনেই ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মনোরমা হাসিয়া ফেলিলেন,—আচ্ছা, তাই যাই, বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং খানিক পরে ললিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাস পড়িয়া বসিলেন।

দু'দিন খেলা হয় নাই, আজ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমিয়া গেল। ললিতারা জিতিতেছিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সহসা কালী আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সেজদি, শেখরদা ডাকচেন—জলদি!

ললিতার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাস-দেওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, শেখরদা অফিসে যাননি?

কি জানি, চলে এসেচেন, বলিয়া সে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

ললিতা তাস রাখিয়া দিয়া মনোরমার মুখপানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাই সই-মা।

মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সে কি রে, আর দু-হাত দেখে যা।

ললিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না সই-মা, ইনি তা হলে বড় রাগ করবেন, বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গিরীন প্রশ্ন করিল, শেখরদাদা আবার কে দিদি?

মনোরমা বলিলেন, ঐ যে সুমুখের ফটকওয়ালা বড় বাড়িটা।

গিরীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—ও—ওই বাড়ি। নবীনবাবু ওঁদের আত্মীয় বুঝি?

মনোরমা মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আত্মীয় কেমন! ললিতাদের ঐ ভিটেটুকু পর্যন্ত বুড়ো আত্মসাৎ করবার ফিকিরে আছেন!

গিরীন আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

মনোরমা তখন গল্প করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া গত বৎসর টাকার অভাবে গুরুচরণবাবুর মেজমেয়ের বিবাহ হইতেছিল না, পরে অসম্ভব সুদে নবীন রায় টাকা ধার দিয়া বাড়িখানি বাঁধা রাখিয়াছেন। এ টাকা কোনদিন শোধ হইবে না এবংঅবশেষে বাড়িটা নবীন রায়ই গ্রহণ করিবেন।

মনোরমা সমস্ত কথা বলিয়া পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুড়ার আন্তরিক ইচ্ছা গুরুচরণবাবুর ভাঙ্গা বাড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐখানে ছোটো ছেলে

শেখরের জন্যে একটি বড় রকমের বাড়ি তৈরি করেন—দুই ছেলের দুই আলাদা বাড়ি—মতলব মন্দ নয়।

ইতিহাস শুনিয়া গিরীনের ক্লেশ বোধ হইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, গুরুচরণবাবুর আরও ত মেয়ে আছে, তাদেরি বা বিয়ে কি করে দেবেন?

মনোরমা বলিলেন, নিজের ত আছেই, তা ছাড়া ললিতা। ওর বাপ-মা নেই, সমস্ত ভার ঐ গরীবের ওপর। বড় হয়ে উঠেচে, এই বছরের মধ্যে বিয়ে না দিলেই নয়। ওদের সমাজে সাহায্য করতে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে—আমরা বেশ আছি গিরীন।

গিরীন চুপ করিয়া রহিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, সেদিন ললিতার কথা নিয়েই ওর মামী আমার কাছে কেঁদে ফেললে—কি করে যে কি হবে তার কিছুই স্থির নেই—ওর ভাবনা ভেবেই হাঁ গিরীন, মুঙ্গেরে তোদের কোননগুরুচরণবাবুর পেটে অন্ন-জল যায় না, বন্ধুবান্ধব এমন নেই যে, শুধু মেয়ে দেখে বিয়ে করে? অমন মেয়ে কিন্তু পাওয়া শক্ত।

গিরীন বিষণ্ণভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, বন্ধুবান্ধব আর পাবো কোথায় দিদি, তবে টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারি।

গিরীনের পিতা ডাক্তারি করিয়া অনেক টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্তরই এখন সে মালিক।

মনোরমা বলিলেন, টাকা, তুই ধার দিবি?

ধার আর কি দেব দিদি—ইচ্ছে হয়, উনি শোধ দেবেন, না হয় নাই দেবেন।

মনোরমা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, তোর টাকা দিয়ে লাভ? ওরা আমাদের আত্মীয়ও নয়, সমাজের লোকও নয়—এমনি কে কাকে টাকা দেয়?

গিরীন তাহার বোনের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে কহিল, সমাজের লোক নাই হলেন, বাঙ্গালী ত? ওঁর একান্ত অভাব, আর আমার

বিস্তর রয়েচে,— তুমি একবার বলে দেখো না দিদি, উনি যদি নিতে রাজি হন, আমি দিতে পারি। ললিতা তাঁদেরও কেউ নয়, আমাদেরও কেউ নয়—তার বিয়ের সমস্ত খরচ না হয় আমিই দেব।

তাহার কথা শুনিয়া মনোরমা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, তথাপি এত টাকা একজন আর একজনকে দিতেছে দেখিলে অনেক স্ত্রীলোকই প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

চারু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে মহা খুশি হইয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তাই দাও মামা, আমি সই-মাকে বলে আসচি।

তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই থাম চারু, ছেলেমানুষ—এ-সব কথায় থাকিস নে। বলতে হয় আমিই বলব।

গিরীন কহিল, তাই বলো দিদি। পরশু রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই গুরুচরণবাবুর সঙ্গে একটুখানি আলাপ হয়েছিল, কথায়বার্তায় মনে হল—বেশ সরল লোক; তুমি কি বল?

মনোরমা বলিলেন, আমিও তাই বলি, সবাই তাই বলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বড় সাদাসিধে মানুষ। সেইজন্যেই ত দুঃখ হয় গিরীন, অমন লোকটিকে হয়ত বাড়িঘর ছেড়ে নিরাশ্রয় হতে হবে। তার সাক্ষী দেখলি নে গিরীন, শেখরবাবু ডাকচেন বলতেই ললিতা কি-রকম তাড়াতাড়ি উঠে পালালো, বাড়িসুদ্ধ লোক ওদের কাছে যেন বিক্রি হয়ে আছে। কিন্তু, যত খোশামোদই করুক না কেন, নবীন রায়ের হাতে গিয়ে একবার যখন পড়েচে, রেহাই পাবে, এ ভরসা কেউ করে না।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বলবে তো দিদি?

আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব। দিয়ে যদি তুই উপকার করতে পারিস, ভালই ত। বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরই বা এত চাড় কেন গিরীন?

চাড় আর কি দিদি, দুঃখ-কষ্টে পরস্পরের সাহায্য করতেই হয়, বলিয়া সে ঈষৎ সলজ্জ-মুখে প্রস্থান করিল। দ্বারের বাহিরে গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার দিদি বলিলেন, আবার বসলি যে?

গিরীন হাসিমুখে বলিল, অত যে কাঁদুনি গাইলে দিদি, হয়ত সব সত্যি নয়।

মনোরমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন?

গিরীন বলিতে লাগিল, ওদের ললিতা যেরকম টাকা খরচ করে সে ত দু:খীর মত মোটেই নয় দিদি। সেদিন আমরা থিয়েটার দেখতে গেলুম, ও নিজে গেল না, তবু দশ টাকা ওর বোনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। চারুকে জিজ্ঞেস কর না, কিরকম খরচ করে; মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম ওর নিজের খরচই চলে না যে।

মনোরমা বিশ্বাস করিলেন না।

চারু বলিল, সত্যি মা। ও-সব শেখরবাবুর টাকা, শুধু এখন নয়, ছেলেবেলা থেকে ওই শেখরদার আলমারি খুলে টাকা নিয়ে আসে—কেউ কিছু বলে না।

মনোরমা মেয়ের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা আনে শেখরবাবু জানেন?

চারু মাথা নাড়িয়া বলিল, জানেন, সুমুখেই চাবি খুলে নিয়ে আসে। গেল মাসে আন্নাকালীর পুতুলের বিয়েতে অত টাকা কে দিলে? সবই ত সই দিলে।

মনোরমা ভাবিয়া বলিলেন, কি জানি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক বটে, বুড়োর মত ছেলেরা অমন চামার নয়—ওরা সব মায়ের ধাত পেয়েচে—তাই দয়াধর্ম আছে। তা ছাড়া, ললিতা মেয়েটি নাকি খুব ভাল, ছেলেবেলা থেকে কাছে কাছে থাকে, দাদা বলে ডাকে, তাই ওকে মায়া-মমতাও সবাই করে। হাঁ চারু, তুই ত

যাওয়া-আসা করিস, ওদের শেখরের এই মাঘ মাসে নাকি বিয়ে হবে? শুনেচি, বুড়ো অনেক টাকা পাবে।

চারু বলিল, হাঁ মা, এই মাঘ মাসেই হবে—সব ঠিক হয়ে গেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরুচরণ লোকটি সেই ধাতের মানুষ—যাহার সহিত যে-কোনও বয়সের লোক অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে। দুই-চারিদিনের আলাপে গিরীনের সহিত তাঁহার একটা স্থায়ী সখ্যতা জন্মিয়া গিয়াছিল। গুরুচরণের চিত্তের বা মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না বলিয়া তর্ক করিতেও তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তর্কে পরাজিত হইলেও তেমনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ তিনি গিরীনকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। অফিস হইতে ফিরিতেই তাঁহার দিবা অবসান হইয়া যাইত। হাত-মুখ ধুইয়া বলিতেন, ললিতে, চা তৈরি হলো মা? কালী, যা যা, তোর গিরীনমামাকে এইবার ডেকে আন। তারপর উভয়ে চা-খাওয়া এবং তর্ক চলিতে থাকিত।

ললিতা কোন কোন দিন মামার আড়ালে বসিয়া চুপ করিয়া শুনিত। সেদিন গিরীনের যুক্তিতর্ক শতমুখে উৎসারিত হইতে থাকিত। তর্কটা প্রায়ই আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধেই হইত। সমাজের হৃদয়হীনতা, অসঙ্গত উপদ্রব এবং অত্যাচার—এ সমস্তই সত্য কথা।

একে ত সমর্থন করিবার বাস্তবিক কিছু নাই, তাহাতে গুরুচরণের উৎপীড়িত অশান্ত হৃদয়ের সহিত গিরীনের কথাগুলা বড়ই খাপ খাইত। তিনি শেষকালে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, ঠিক কথা গিরীন। কার ইচ্ছে আর না করে নিজের মেয়েদের যথাসময়ে ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে, কিন্তু দিই কি করে? সমাজ বলচেন দাও বিয়ে—মেয়ের বয়স হয়েচে, কিন্তু দেবার বন্দোবস্ত করে ত দিতে পারেন না। যা বলেচ গিরীন, এই আমাকে দিয়েই দ্যাখ না কেন, বাড়িটুকু পর্যন্ত বন্ধক পড়েচে, দু'দিন পরে ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে

হবে—সমাজ তখন ত বলবেন না, এসো, আমার বাড়িতে আশ্রয় নাও। কি বল হে?

গিরীন হয়ত চুপ করিয়া থাকিত, গুরুচরণ নিজেই বলিতেন, খুব সত্য কথা। এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই না খাই, শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙ্গায় আর গলা চেপে ধরে সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও নয়—এ সমাজ বড়লোকের জন্যে। ভাল, তারাই থাক, আমাদের কাজ নাই। বলিয়া গুরুচরণ সহসা চুপ করিতেন।

যুক্তিতর্কগুলি ললিতা শুধুই মন দিয়া শুনিত না, রাত্রে বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিত নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিত। প্রতি কথাটি তাহার মনের উপর গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে বলিত, যথার্থই গিরীনবাবুর কথাগুলি অতিশয় ন্যায়সঙ্গত।

মামাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, সেই মামার স্বপক্ষে টানিয়া গিরীন যাহাই কিছু বলিত, সমস্তই তাহার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইত। তাহার মামা, বিশেষ করিয়া তাহারি জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, অন্ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে—তাহার নির্বিরোধী দুঃখী মামা তাহাকে আশ্রয় দিয়াই—এত ক্লেশ পাইতেছে! কিন্তু কেন?

কেন মামার জাত যাবে? আজ আমার বিয়ে দিয়ে, কাল যদি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসি, তাহলে ত জাত যাবে না। অথচ তফাৎ কিসের? গিরীনের এই সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি সে তাহার ভারাতুরা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া আর একবার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

তাহার মামার হইয়া, মামার দুঃখ বুঝিয়া, যে-কেহ কথা কহিত, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, তাহার মতের সহিত মত না মিলাইয়া ললিতার অন্য পথ ছিল

না। সে গিরীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ গুরুচরণের মত সেও সন্ধ্যার চা-পানের সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে গিরীন ললিতাকে 'আপনি' বলিয়া ডাকিত। গুরুচরণ নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, ওকে আবার 'আপনি' কেন গিরীন, 'তুমি' বলে ডেকো। তখন হইতে সে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল।

একদিন গিরীন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি চা খাও না ললিতা?

ললিতা মুখ নিচু করিয়া ঘাড় নাড়িলে, গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, ওর শেখরদার বারণ আছে। মেয়েমানুষের চা খাওয়া সে ভালবাসে না।

হেতু শুনিয়া যে গিরীন সুখী হইতে পারে নাই, ললিতা সেটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল।

আজ শনিবার। অন্যদিনের অপেক্ষা এই দিনটার সভা ভাঙ্গিতে অধিক বিলম্ব হইল।

চা-খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ আজ আলোচনায় তেমন উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতেছিলেন না, মাঝে মাঝে কি-একরকম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন।

গিরীন সহজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ আপনার দেহটা বোধ করি তেমন ভাল নাই?

গুরুচরণ হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন, কেন? দেহ ত বেশ ভালই আছে।

গিরীন সঙ্কোচের সহিত বলিল, তাহলে অফিসে কি কিছু—

না, তাও ত কিছু নয়, বলিয়া গুরুচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত গিরীনের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভিতরের উদ্বেগ যে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছিল তাহা এই নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষটি বুঝিতেই পারেন নাই।

ললিতা পূর্বে একেবারেই চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু আজকাল দু'-একটা কথায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিল। সে বলিল, হাঁ মামা, আজ তোমার হয়ত মন ভাল নেই।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ও সেই কথা! হ্যাঁ মা, ঠিক ধরেচিস বটে, আজ আমার সত্যিই মন ভাল নেই।

ললিতা ও গিরীন উভয়েই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গুরুচরণ বলিলেন, নবীনদা সমস্ত জেনেশুনে গোটা-কতক শক্ত কথা পথে দাঁড়িয়েই শুনিয়ে দিলেন। আর তাঁরই বা দোষ কি, ছ'মাস হয়ে গেল, একটা পয়সা সুদ দিতে পারলুম না, তা আসল দূরে থাক।

ব্যাপারটা ললিতা বুঝিয়াই চাপা দিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কান্ডজ্ঞানহীন মামা পাছে ঘরের লজ্জাকর কথাগুলা পরের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবো না মামা, সে-সব পরে হবে।

কিন্তু গুরুচরণ সেদিক দিয়াও গেলেন না। বরং বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, পরে আর কি হবে মা? তা নয় গিরীন, আমার এই মা'টি চায় তার বুড়ো ছেলেটি যেন কিছু ভাবনা-চিন্তা না করে। কিন্তু বাইরের লোকে যে তোর দুঃখী মামার দুঃখটা চেয়ে দেখতেই চায় না, ললিতে।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, নবীনবাবু আজ কি বললেন?

গিরীন যে সমস্ত কথাই জানে ললিতা তাহা জানিত না, তাই তাহার প্রশ্নটাকে অসঙ্গত কৌতূহল মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

গুরুচরণ খুলিয়া বলিলেন। নবীন রায়ের স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি রোগ কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকেরা বায়ু-পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থের প্রয়োজন, অতএব এই সময়ে গুরুচরণের সমস্ত সুদ এবং কিছু আসল দিতে হইবে।

গিরীন ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, একটা কথা আপনাকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি, যদি কিছু না মনে করেন আজ তা হলে বলি।

গুরচরণ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমাকে কোন কথা বলতে কেউ কখন ত সঙ্কোচ করে না গিরীন,—কি কথা?

গিরীন বলিল, দিদির কাছে শুনেচি, নবীনবাবুর খুব বেশী সুদ। তাই বলি, আমার অনেক টাকাই ত অমনি পড়ে রয়েছে, কোনও কাজেই আসে না, আর, তাঁরও দরকার, না হয় এই ঋণটা শোধ করেই দিন না?

ললিতা ও গুরুচরণ উভয়েই আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গিরীন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিল, আমার এখন ত টাকার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, তাই যখন আপনার সুবিধা হবে, ফিরিয়ে দিলেই চলবে, ওঁদের আবশ্যক, সেইজন্যে বলছিলাম যদি—

গুরুচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, সমস্ত টাকাটা তুমি দেবে?

গিরীন মুখ নিচু করিয়া বলিল, বেশ ত, তাঁদের উপকার হয়—

গুরুচরণ প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। সেজদি, জলদি— শেখরদা কাপড় পরে নিতে বললেন—থিয়েটার দেখতে যেতে হবে,—বলিয়াই যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া গুরুচরণ হাসিলেন। ললিতা স্থির হইয়া রহিল।

আন্নাকালী মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৈ, উঠলে না সেজদি, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েচি যে!

তথাপি ললিতা উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। সে শেষ পর্যন্ত শুনিয়া যাইতে চায়, কিন্তু গুরুচরণ কালীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া ললিতার মাথায় একটা হাত দিয়া বলিলেন, তাহলে যা মা, দেরি করিস নে—তোর জন্যে বুঝি সবাই অপেক্ষা করে আছে।

অগত্যা ললিতাকে উঠিতে হইল। কিন্তু, যাইবার পূর্বে গিরীনের মুখের পানে সে যে গভীর কৃতজ্ঞদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, গিরীন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল।

মিনিট-দশেক পরে কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে পান দিবার ছুতা করিয়া আর একবার বাহিরের ঘরে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গিরীন চলিয়া গিয়াছে। একাকী গুরুচরণ মোটা বালিশটা মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার মুদিত চক্ষুর দুই পাশ বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ যে আনন্দাশ্রু, ললিতা তাহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিল না, যেমন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে সে যখন শেখরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার নিজের চোখ দুটিও অশ্রুভারে ছলছল করিতেছিল। কালী ছিল না, সে সকলের আগে গাড়িতে গিয়া বসিয়াছিল, একাকী শেখর তাহার ঘরের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি ললিতার অপেক্ষাতেই ছিল, মুখ তুলিয়া তাহার জলভারাক্রান্ত চোখ দুটি লক্ষ্য করিল।

সে আট-দশ দিন ললিতাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে তাহা ভুলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি, কাঁদচ নাকি?

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িল।

এই কয়দিনের একান্ত অদর্শনে শেখরের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাই সে কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া সহসা ললিতার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, সত্যিই কাঁদচ যে! হলো কি?

ললিতা এবার নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীন রায় সমস্ত সুদ আসল কড়াক্রান্তি গণিয়া লইয়া বন্ধকী কাগজখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, বলি, টাকাটা দিলে কে হে?

গুরুচরণ নম্রভাবে কহিলেন, সেটা জিজ্ঞেস করবেন না দাদা, বলতে নিষেধ আছে।

টাকাটা ফেরত পাইয়া নবীন কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হন নাই, এটা আশাও করেন নাই, ইচ্ছাও করেন নাই। বরং বাড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কিরূপ নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, তাহাই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লেষ করিয়া বলিলেন, তা এখন নিষেধ ত হবেই। ভায়া, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। দোষ, টাকাটা ফিরে চাওয়ার, নইলে কলিকাল বলেচে কেন!

গুরুচরণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, সে কি কথা দাদা! আপনার টাকার ঋণটাই শোধ করেচি, কিন্তু আপনার দয়ার ঋণ ত শোধ করতে পারিনি।

নবীন হাসিলেন। তিনি পাকা লোক, এ-সকল কথা বিশ্বাস করিলে গুড় বেচিয়া এত টাকা করিতে পারিতেন না। বলিলেন, সে যদি সত্যিই ভাবতে ভায়া, তা হলে এমন করে শোধ করে দিতে না। না হয় একবার টাকাটাই চেয়েছিলাম, সেও তোমারই বৌঠানের অসুখের জন্যে, আমার নিজের জন্যে কিছু নয়,—বলি কত সুদে বন্ধক রাখলে বাড়িটা?

গুরুচরণ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বন্ধক রাখিনি—সুদের কথাও কিছু হয়নি।

নবীন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, বল কি, শুধু-হাতে?

হাঁ দাদা, একরকম তাই বটে। ছেলেটি বড় সৎ, বড় দয়ার শরীর।

ছেলেটি? ছেলেটি কে?

গুরুচরণ এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। যতটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এতটাও তাঁহার বলা উচিত ছিল না।

নবীন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, যখন নিষেধ আছে তখন কাজ নেই, কিন্তু সংসারের অনেক জিনিসই দেখেচি বলে এইটুকু সাবধান করে দিই ভায়া, তিনি যেই হোন, এত ভাল করতে গিয়ে শেষকালে যেন ফ্যাসাদে না ফেলেন।

গুরুচরণ সে-কথায় আর জবাব না দিয়া নমস্কার করিয়া কাগজখানি হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় প্রতি বৎসরই ভুবনেশ্বরী এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে ঘুরিয়া আসিতেন। তাঁহার অজীর্ণ রোগ ছিল, ইহাতে উপকার হইত। রোগ বেশি নয়। নবীন গুরুচরণের কাছে সেদিন কার্যোদ্ধারের জন্যই বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন। যাই হোক, যাত্রার আয়োজন হইতেছিল।

সেদিন সকালবেলা একটা চামড়ার তোরঙ্গে শেখর তাহার আবশ্যকীয় শৌখিন জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল।

আন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, শেখরদা, তোমরা কাল যাবে, না?

শেখর তোরঙ্গ হতে মুখ তুলিয়া বলিল, কালী, তোর সেজদিকে ডেকে দে, কি সঙ্গে নেবে-টেবে, এই সময়ে দিয়ে যাক। ললিতা প্রতি বৎসর মায়ের সঙ্গে যাইত, এবারেও যাইবে তাহাই শেখর জানিত।

কালী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এবার সেজদি ত যাবে না!

কেন যাবে না?

কালী কহিল, বাঃ, কি করে যাবে! মাঘ-ফাল্গুন মাসে ওর বিয়ে হবে, বাবা বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে।

শেখর নির্নিমেষ চোখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কালী বাড়ির ভিতরে যাহা শুনিয়াছিল উৎসাহের সহিত ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু বলেচেন যত টাকা লাগে ভাল পাত্তর চাই। বাবা আজও অফিসে যাবেন না, খেয়েদেয়ে কোথায় ছেলে দেখতে যাবেন; গিরীনবাবুও সঙ্গে যাবেন।

শেখর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল এবং কেন যে ললিতা আর আসিতে চাহে না তাহারও যেন কতকটা কারণ বুঝিতে পারিল।

কালী বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু খুব ভালমানুষ শেখরদা। মেজদির বিয়ের সময় আমাদের বাড়ি জ্যাঠামশায়ের কাছে বাঁধা ছিল ত, বাবা বলেছিলেন, আর দু'মাস-তিনমাস পরেই আমাদের সবাইকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হ'ত, তাই গিরীনবাবু টাকা দিলেন। কাল সব টাকা জ্যাঠামশায়কে বাবা ফিরিয়ে দিয়েচেন। সেজদি বলছিল, আর আমাদের কোনও ভয় নেই, সত্যি না শেখরদা?

প্রত্যুত্তরে শেখর কিছুই বলিতে পারিল না, তেমনিই চাহিয়া রহিল।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ শেখরদা?

এইবার শেখরের চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না রে। কালী, তোর সেজদিকে একবার শিগগির ডেকে দে, বল আমি ডাকচি, যা ছুটে যা।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শেখর খোলা তোরঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কোন্ দ্রব্যে তাহার প্রয়োজন, কোন্ দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সমস্তই এখন তাহার চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া গেল।

ডাক শুনিয়া ললিতা উপরে আসিয়া প্রথমে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাহার শেখরদা মেঝের উপর একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার এ-রকম মুখের ভাব সে পূর্বে কখনও দেখে নাই। ললিতা আশ্চর্য

হইল, ভয় পাইল। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে শেখর 'এসো' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ললিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডাকছিলে?

হ্যাঁ, বলিয়া শেখর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালের গাড়িতেই আমি মাকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্চি, এবার ফিরতে হয়ত দেরি হবে। এই চাবি নাও, তোমার খরচের টাকাকড়ি ও-দেরাজের মধ্যেই রইল।

প্রতিবার ললিতাও সঙ্গে যায়। গতবারে এই উপলক্ষে সে কি আনন্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছিল, এবার সে কাজটা শেখরদা একা করিতেছে, খোলা তোরঙ্গের দিকে চাহিবামাত্রই ললিতার তাহা মনে পড়ল।

শেখর তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া একবার কাশিয়া গলাটা পরিস্কার করিয়া বলিল, সাবধানে থেকো—আর যদি কোন কিছুর বিশেষ আবশ্যক হয়, দাদার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে চিঠি লিখো।

অতঃপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। এবার ললিতা সঙ্গে যাইবে না, শেখর তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার কারণটাও হয়ত শুনিয়াছে মনে করিয়া ললিতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ শেখর কহিল, আচ্ছা যাও এখন, আমাকে আবার এইগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। বেলা হলো, আজ একবার অফিসেও যেতে হবে।

ললিতা খোলা তোরঙ্গের সমুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, তুমি স্নান কর গে, আমি গুছিয়ে দিচ্চি।

তাহলে ত ভালই হয়, বলিয়া শেখর চাবির গোছাটা ললিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার কি কি দরকার হয়, তা ভুলে যাওনি ত?

ললিতা মাথা ঝুঁকাইয়া তোরঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল, সে-কথার কোন জবাব দিল না।

শেখর নীচে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কালীর সমস্ত সংবাদই সত্য। গুরুচরণ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, সে কথাও সত্য। ললিতার পাত্র স্থির করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে তাহাও সত্য। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

ঘন্টা-দুই পরে স্নানাহার শেষ করিয়া অফিসের পোশাক পরিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল।

এই দুই ঘণ্টাকাল ললিতা কিছুই করে নাই, তোরঙ্গের একটা পাটির উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শেখরের পদশব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার দুই চোখ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু, শেখর তাহা দেখিয়াও দেখিল না, অফিসের পোশাক পরিতে পরিতে সহজভাবে বলিল, এখন পারবে না ললিতা, দুপুরবেলা এসে গুছিয়ে রেখো। বলিয়া প্রস্তুত হইয়া অফিসে চলিয়া গেল। সে ললিতার রাঙ্গা চোখের হেতু ঠিক বুঝিয়াছিল, কিন্তু সব দিক বেশ করিয়া চিন্তা না করা পর্যন্ত আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সেদিন অপরাহ্নে মামাদের চা দিতে আসিয়া ললিতা সহসা জড়সড় হইয়া পড়িল। আজ শেখর বসিয়া ছিল। সে গুরুচরণবাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিল।

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া দু'বাটি চা প্রস্তুত করিয়া গিরীন ও তাহার মামার সম্মুখে দিতেই গিরীন কহিল, শেখরবাবুকে চা দিলে না ললিতা?

ললিতা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, শেখরদা চা খান না।

গিরীন আর কিছু বলিল না, ললিতার নিজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শেখর নিজে এটা খায় না, অপরে খায় তাহাও ইচ্ছা করে না।

চায়ের বাটি হাতে তুলিয়া লইয়া গুরুচরণ পাত্রের কথা পাড়িলেন। ছেলেটি বি. এ. পড়িতেছে, ইত্যাদি বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া শেষে বলিলেন, অথচ আমাদের গিরীনের পছন্দ হয়নি। অবশ্য ছেলেটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নয় বটে, কিন্তু পুরুষমানুষের রূপ আর কোন্ কাজে লাগে, গুণ থাকলেই যথেষ্ট।

কোনোমতে বিবাহটা হইয়া গেলেই গুরুচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

শেখরের সহিত গিরীনের এইমাত্র সামান্য পরিচয় হইয়াছিল। শেখর তাহার দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গিরীনবাবুর পছন্দ হলো না কেন? ছেলেটি লেখাপড়া করছে, অবস্থাও ভাল,—এই ত সুপাত্র।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু সে ঠিক বুঝিয়াছিল কেন ইহার পছন্দ হয় নাই এবং কেন ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু, গিরীন সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইল, শেখর তাহাও লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাকা, কাল মাকে নিয়ে পশ্চিমে চললুম, ঠিক সময়ে খবর দিতে যেন ভুলে যাবেন না।

গুরুচরণ বলিলেন, সে কি বাবা, তোমরাই যে আমার সব। তা ছাড়া, ললিতার মা উপস্থিত না থাকলে ত কোনও কাজই হতে পারবে না। কি বলিস মা ললিতা? বলিয়া হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, সে উঠে গেল কখন?

শেখর কহিল, কথা উঠতেই পালিয়েচে।

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালাবে বৈ কি,—হাজার হোক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েচে ত। বলিয়া সহসা একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মা আমার একাধারে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী! এমন মেয়ে বহু ভাগ্যে মেলে শেখরনাথ! কথাটা উচ্চারণ করিতেই তাঁর শীর্ণ কৃশ মুখের উপর গভীর স্নেহের এমন একটা স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াপাত হইল যে, গিরীন ও শেখর উভয়েই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চায়ের মজলিস হইতে নিঃশব্দে পলাইয়া আসিয়া ললিতা শেখরের ঘরে ঢুকিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের নীচে একটা তোরঙ্গ আনিয়া শেখরের গরম বস্ত্রগুলি পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, শেখরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল।

মকদ্দমায় সর্বস্ব হারিয়া মানুষ যে-রকম মুখ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আইসে, এ-বেলার মানুষকে যেন ও-বেলায় সহসা আর চিনিতে পারা যায় না, এই একঘন্টার মধ্যে তেমনি শেখরকে ললিতা যেন ঠিক চিনিতে পারিল না। তাহার মুখের উপর সর্বস্ব হারানোর সমস্ত চিহ্ন যেন কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

শেখর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্চে ললিতা?

ললিতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা হাত লইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, কি হয়েচে শেখরদা?

কৈ, কিছুই হয়নি ত, বলিয়া শেখর জোর করিয়া একটু হাসিল। ললিতার করস্পর্শে তাহার মুখে কতকটা সজীবতা ফিরিয়া আসিল। সে নিকটস্থ একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সেই প্রশ্নই করিল, তোমার হচ্চে কি?

ললিতা কহিল, মোটা ওভারকোটটা সঙ্গে দিতে ভুলেছিলুম, সেইটাই দিতে এসেচি।

শেখর শুনিতে লাগিল। ললিতা এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিল, গতবারে গাড়িতে তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, বড় কোট ত অনেকগুলোই ছিল, কিন্তু খুব মোটাসোটা একটাও ছিল না। তাই আমি ফিরে এসেই দোকানে মাপ দিয়ে এইটে তৈরি করিয়েছিলুম, বলিয়া সে খুব ভারী একটা ওভারকোট তুলিয়া আনিয়া শেখরের কাছে রাখিল।

শেখর হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, কৈ, আমাকে বলনি ত?

ললিতা হাসিয়া বলিল, তুমি 'বাবু' মানুষ, তোমাকে বললে কি এত মোটা কোট তৈরি করতে দিতে? তাই বলিনি, তৈরি করিয়ে তুলে রেখেছিলুম।—বলিয়া সেটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, ঠিক উপরেই রইল, তোরঙ্গ খুললেই পাবে—শীত করলে গায়ে দিতে ভুলো না যেন।

আচ্ছা, বলিয়া শেখর নির্নিমেষ চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, না, এমন হতেই পারে না।

কি হতে পারে না? গায়ে দেবে না?

শেখর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, সে-কথা নয়-ও অন্য কথা। আচ্ছা ললিতা, মার জিনিসপত্র গোছান হয়েচে কি না জানো?

ললিতা কহিল, জানি, দুপুরবেলা আমিই সে-সমস্ত গুছিয়ে দিয়েছি, বলিয়া সে আর একবার সমস্ত দ্রব্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিতে লাগিল।

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ললিতা, আসচে বছর আমার উপায় কি হবে বলতে পার?

ললিতা চোখ তুলিয়া বলিল, কেন?

কেন সে আমিই টের পাচ্চি ভাই, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের কথাটা চাপা দিবার জন্য শুষ্কমুখে প্রফুল্লতা টানিয়া আনিয়া বলিল, কিন্তু পরের ঘরে যাবার আগে কোথায় কি আছে না আছে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে যেয়ো—নইলে দরকারের সময় কিছুই খুঁজে পাব না।

ললিতা রাগিয়া বলিল, যাও—

শেখর এতক্ষণে হাসিল, বলিল, যাও ত জানি, কিন্তু সত্যই উপায় হবে কি? আমার শখ ত আছে ষোল আনা, কিন্তু এক কড়ার শক্তি নেই। এ-সব কাজ চাকর দিয়েও হয় না—এখন থেকে দেখচি, তোমার মামার মত হতে হবে—এক কাপড় এক চাদর সম্বল করে—যা হয় তাই হবে।

ললিতা চাবির গোছাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কাল সকালে একবার এসো।

ললিতা শুনিয়াও শুনিল না, দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় নামিয়া গেল। বাড়ি গিয়া দেখিল, ছাদের এক কোণে চাঁদের আলোয় বসিয়া আন্নাকালী একরাশ গাঁদাফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। ললিতা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, হিমে বসে কি করছিস কালী?

কালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, মালা গাঁথচি—আজ রাত্তিরে আমার মেয়ের বিয়ে।

কৈ, আমাকে বলিস নি ত?

ঠিক ছিল না সেজদি। এখন বাবা পাঁজি দেখে বললেন, আজ রাত্তির ছাড়া আর এ-মাসে দিন নেই। মেয়ে বড় হয়েচে, আর রাখতে পারিনে, যেমন-তেমন করে বিদেয় করছি। সেজদি দুটো টাকা দাও না, জলখাবার আনাই।

ললিতা হাসিয়া বলিল, টাকার বেলায় সেজদি। যা, আমার বালিশের নীচে আছে, নিগে যা। হাঁ রে কালী, গাঁদাফুলে কি বিয়ে হয়?

কালী গম্ভীরভাবে বলিল, হয়। অন্য ফুল না পেলে হয়। আমি কতগুলো মেয়ে পার করলুম সেজদি। আমি সব জানি,—বলিয়া খাবার আনাইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল।

খানিক পরে কালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর সকলকেই বলা হয়েচে শুধু শেখরদাকে বলা হয়নি—যাই, বলে আসি, নইলে তিনি দুঃখ করবেন, বলিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল।

কালী পাকা গৃহিণী, সমস্ত কাজকর্মই সে সুশৃঙ্খলায় করে। শেখরদাদাকে সংবাদ দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, তিনি একছড়া মালা চাইলেন। যাও না

সেজদি, শিগগির করে দিয়ে এসো না। আমি ততক্ষণ এদিকে বন্দোবস্ত করি—লগ্ন শুরু হয়ে গেছে, আর সময় নেই।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি পারব না কালী, তুই দিয়ে আয়।

আচ্ছা যাচ্চি। ওই বড় ছড়াটা দাও, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

ললিতা হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসচি।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যাও সেজদি, আমার অনেক কাজ—মরবার ফুরসত নেই।

তার মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গী দেখিয়া ললিতা হাসিয়া ফেলিল। একেবারে পাকা বুড়ি, বলিয়া হাসিয়া মালা লইয়া চলিয়া গেল। কবাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শেখর একমনে চিঠি লিখিতেছে। দোর খুলিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতেও শেখর টের পাইল না! তখন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালাছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই চৌকির পিছনে বসিয়া পড়িল।

শেখর প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এই কালী! পরক্ষণেই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, ও কি করলে ললিতা!

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেখরের মুখের ভাবে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া বলিল, কেন, কি?

শেখর পূর্ণমাত্রায় গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া বলিল, জান না কি? কালীকে জিজ্ঞেস করে এসো, আজকের রাত্তিরে গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয়।

এখন ললিতা বুঝিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ ভীষণ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে না, কক্ষনো না,—কক্ষনো না, বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেখর ডাকিয়া বলিল, যেয়ো না ললিতা, শুনে যাও—বিশেষ কাজ আছে—

শেখরের ডাক তাহার কানে গেল বটে, কিন্তু শুনিবে কে? কোথাও সে থামিতে পারিল না, দৌড়িয়া আসিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একেবারে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া সে শেখরের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন এমন কথা শোনে নাই। একে ত গম্ভীরপ্রকৃতি শেখর কখনই তাহাকে পরিহাস করিত না, করিলেও এতবড় লজ্জাকর পরিহাস যে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, ইহা সে ত কল্পনা করিতেও পারিত না। লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মিনিট-কুড়ি পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিয়া বসিল। অথচ, শেখরকে সে মনে মনে ভয় করিত, তিনি বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাই যাইবে কি না ইহাই ললিতা উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ও-বাড়ির ঝির গলা শোনা গেল, ললিতাদি কোথায় গা, ছোটবাবু এবার ডাকচেন—

ললিতা বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, যাচ্ছি, যাও। উপরে আসিয়া কবাট ফাঁক করিয়া দেখিল শেখর তখনও চিঠি লিখিতেছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কেন?

শেখর লিখিতে লিখিতে বলিল, কাছে এসো বলছি।

না ঐখান থেকে বল।

শেখর মনে মনে হাসিয়া বলিল, হঠাৎ কি একটা কাজ করে ফেললে বল ত?

ললিতা রষ্টভাবে বলিল, যাও—আবার!

শেখর মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমার দোষ কি! তুমিই ত করে গেলে—

কিছু করিনি—তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর কহিল, সেইজন্যই ত ডেকে পাঠিয়েছি ললিতা। কাছে এসো, ফিরিয়ে দিচ্চি। তুমি অর্ধেকটা করে গেছ, সরে এসো, আমি সেটা সম্পূর্ণ করে দি।

ললিতা দ্বারের অন্তরালে ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিল, সত্যি বলছি তোমাকে, ও-রকম ঠাট্টা করলে আর কোনদিন তোমার সামনে আসবো না—বলচি, ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া মালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, নিয়ে যাও।

তুমি ঐখান থেকে ছুঁড়ে দাও।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কাছে না এলে পাবে না।

তবে আমার কাজ নেই, বলিয়া ললিতা রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কিন্তু অর্ধেকটা হয়ে থাকলো—

থাকে থাক, বলিয়া ললিতা যথার্থই রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নীচে গেল না। পূর্বদিকে খোলা ছাদের একান্তে গিয়া রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তখন সম্মুখের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং শীতের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল। উপরে স্বচ্ছ নির্মল নীলাকাশ। সে একবার শেখরের ঘরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। এইবার তাহার চোখ জ্বালা করিয়া লজ্জায় অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। সে এত ছোট নহে যে, এ-সব কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তবে কেন তাহাকে এমন মর্মান্তিক উপহাস করা! সে যে কত তুচ্ছ, কত নীচে, এ-কথা বুঝিবার তাহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। সে ঠিক জানে, সে অনাথ এবং নিরুপায় বলিয়া তাহাকে সবাই আদর ও যত্ন করে—শেখরও করে, তাহার জননীও করেন। তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সত্যকার দায়িত্ব তাহার কাহারও উপর নির্ভর করে না বলিয়াই গিরীন্দ্র সম্পূর্ণ পর হইয়াও তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিবার কথা তুলিতে পারিয়াছেন।

ললিতা চোখ মুদিয়া মনে মনে বলিল, এই কলিকাতার সমাজে তাহার মামার অবস্থা ত শেখরদের কত নীচে, সে আবার সেই মামার আশ্রিত গলগ্রহ।

ওদিকে সমান ঘরে শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, দু'দিন আগেই হউক, পাছেই হউক, সেই ঘরেই একদিন হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষে নবীন রায় কত টাকা আদায় করিবেন, সে-সব আলোচনাও সে শেখরের জননীর কাছে শুনিয়াছে।

তবে কেন, তাহাকে হঠাৎ আজ এমন করিয়া শেখরদা অপমান করিয়া বসিল! এই সব কথা ললিতা সুমুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের মনে মগ্ন হইয়া আলোচনা করিতেছিল, সহসা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শেখর নিঃশব্দে হাসিতেছে। ইতিপূর্বে যে উপায়ে মালাটা সে শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে সেই গাঁদা ফুলের মালাটা তাহার নিজের গলায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কান্নায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু সে জোর করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, কেন এমন করলে?

তুমি করেছিলে কেন?

আমি কিছু করিনি, বলিয়াই সে মালাটা টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য হাত দিয়াই হঠাৎ শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। আর ছিঁড়িয়া ফেলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কাঁদিয়া বলিল, আমার কেউ নেই বলেই ত তুমি এমন করে আমাকে অপমান করচ!

শেখর এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, ললিতার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। এ ত ছেলেমানুষের কথা নয়! কহিল, আমি অপমান করছি, না, তুমি আমাকে অপমান করছ?

ললিতা চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আমি কৈ অপমান করলুম?

শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল, এখন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে। আজকাল বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছিলে ললিতা, আমি বিদেশ যাবার আগে সেইটেই তোমার বন্ধ করে দিলাম।—বলিয়া চুপ করিল।

ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতলে দু'জনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নীচ হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেখর কহিল, আর হিমে দাঁড়িয়ে থেক না, নীচে যাও।

যাচ্চি, বলিয়া ললিতা এতক্ষণ পরে তাহার পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করব বলে দিয়ে যাও।

শেখর হাসিল। একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া নত হইয়া তাহার অধরে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, কিছুই বলে দিতে হবে না ললিতা, আজ থেকে আপনিই বুঝতে পারবে।

ললিতার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি হঠাৎ তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ফেলেচি বলেই কি তুমি এ-রকম করলে?

শেখর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবচি, কিন্তু স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ স্থির করেছি, কেন না, আজই ঠিক বুঝতে পেরেচি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ললিতা বলিল, কিন্তু তোমার বাবা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন, মা শুনলে দুঃখ করবেন—এ হবে না শে—

বাবা শুনলে রাগ করবেন সত্যি, কিন্তু মা খুব খুশী হবেন। সে যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে—এখন তুমিও ফেরাতে পার না, আমিও পারিনে। যাও, নীচে গিয়ে মাকে প্রণাম কর গে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস-তিনেক পরে একদিন গুরুচরণ ম্লানমুখে নবীন রায়ের ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর বসিবার উপক্রম করিতেই, তিনি চিৎকার করিয়া নিষেধ করিলেন, না না না, এখানে নয়—ঐ চৌকির উপর ব'সো গিয়ে। আমি অসময়ে আবার স্নান করতে পারব না—বলি, জাত দিয়েচ না কি হে?

গুরুচরণ দূরে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

দিন-চারেক পূর্বে সে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিল, আজ সেই সংবাদটা নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া গোঁড়া হিন্দু নবীনের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। নবীনের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু গুরুচরণ তেমনি মৌন নতমুখে বসিয়া রহিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজটা করিয়া অবধি বাড়িতে কান্নাকাটি এবং অশান্তির পরিসীমা ছিল না।

নবীন পুনরায় তর্জন করিয়া উঠিলেন, বল না হে, সত্যি কি না?

গুরুচরণ জলভারাক্রান্ত দুই চক্ষু তুলিয়া বলিল, আজ্ঞে, সত্যি।

কেন এমন কাজ করলে? তোমার মাইনে ত মোটে ষাটটি টাকা, তুমি—ক্রোধে নবীন রায়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

গুরুচরণ চোখ মুছিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, জ্ঞান ছিল না দাদা। দুঃখের জ্বালায় গলাতেই দড়ি দেবো, কি ব্রহ্মজ্ঞানীই হবো, কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম, আত্মঘাতী না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীই হই, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীই হয়ে গেলুম।

গুরুচরণ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন চিৎকার করিয়া বলিলেন, বেশ করেচ, নিজের গলায় দড়ি না দিতে পেরে জাতের গলায় দড়ি টাঙ্গিয়ে দিয়েছ—আচ্ছা যাও, আর আমাদের সামনে কালামুখ বার করো না, এখন যাঁরা-সব মন্ত্রী হয়েচেন, তাঁদের সঙ্গেই থাক গে—মেয়েদের হাড়ি-মুচির ঘরে দেও গে যাও, বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

নবীন রাগে অভিমানে কি যে করিবেন প্রথমটা কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। গুরুচরণ হাতের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে, আর শীঘ্র মুঠার মধ্যে আসিবে, এ সম্ভাবনাও নাই—তাই নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করিয়া আপাতত জব্দ করিবার আর কোন ফন্দি খুঁজিয়া না পাইয়া, সেইদিনই মিস্ত্রী ডাকিয়া ছাদের যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া একটা মস্ত প্রাচীর তুলিয়া দিলেন।

এই সংবাদ বহুদূর-প্রবাসে বসিয়া ভুবনেশ্বরী শেখরের মুখে শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—শেখর, এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে তাকে?

মতি-বুদ্ধি কে দিয়েছিল শেখর তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল। সে উল্লেখ না করিয়া বলিল, কিন্তু মা, দু'দিন পরে তোমরাই ত তাঁকে একঘরে করে রাখতে। এতগুলি মেয়ের বিয়ে তিনি কি করে দিতেন, আমি ত ভেবে পাইনে।

ভুবনেশ্বরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, কিছুই আটকে থাকে না শেখর। আর সেজন্য আগে থেকে জাত দিতে হলে অনেককেই দিতে হয়। ভগবান যাদের সংসারে পাঠিয়েছেন, তিনিই তাদের ভার নিতেন।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। ভুবনেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ললিতা মেয়েটাকে যদি সঙ্গে আনতুম, তা হলে যা হয় একটা উপায় আমাকেই করে দিতে হতো—দিতামও। আমি ত জানিনে গুরুচরণ এই-সব মতলব করেই পাঠিয়ে দিলে না। আমি মনে করেছিলুম বুঝি সত্যিই তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে।

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি লজ্জিতভাবে বলিল, বেশ ত মা, এখন বাড়ি গিয়ে তাই কর না কেন? সে ত আর ব্রাহ্ম হয়নি—তার মামাই

হয়েচে—আর তিনিও কিছু তার যথার্থ আপনার কেউ ন'ন। ললিতার কেউ নেই বলেই তাঁর ঘরে মানুষ হচ্চে।

ভুবনেশ্বেরী ভাবিয়া বলিলেন, তা বটে, কিন্তু কর্তা এক রকমের মানুষ, তিনি কিছুতেই রাজি হবেন না। হয়ত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেবেন না।

শেখরের নিজের মনেও এই আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে আর একমিনিটও তাহার বিদেশে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। দু-তিনদিন চিন্তিত, অপ্রসন্ন-মুখে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিল, আর ভাল লাগচে না মা, চল বাড়ি যাই!

ভুবনেশ্বরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই চল শেখর, আমারও কিছু ভাল লাগচে না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মাতাপুত্র উভয়েই দেখিলেন, ছাদের সেই যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া প্রাচীর উঠিয়াছে। গুরুচরণের সহিত আর কোনও সম্পর্ক রাখা, এমন কি, মুখের আলাপ রাখাও যে কর্তার অভিপ্রেত নয়, তাহা কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়াই উভয়ে বুঝিলেন।

রাত্রে শেখরের আহারের সময় মা উপস্থিত ছিলেন, দুই-একটা কথার পরে বলিলেন, ওদের গিরীনবাবুর সঙ্গেই ললিতার বিয়ে দেবার কথাবার্তা হচ্ছে। আমি তা আগেই বুঝেছিলুম।

শেখর মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কে বললে?

ওর মামী। দুপুরবেলা কর্তা ঘুমোলে আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেচি। সেই অবধি কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেললে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া তিনি নিজের চোখ দুটি আচঁলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কপাল, শেখর, কপাল। এই কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না—কার আর দোষ দিই বল!

যাই হোক, গিরীন ছেলেটি ভাল, সঙ্গতিও আছে, ললিতার কষ্ট হবে না,—বলিয়া চুপ করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শেখর কোন কথাই বলিল না—মুখ নিচু করিয়া খাবারগুলা হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সেও উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যার পর একটুখানি ঘুরিয়া আসিবার জন্য সে পথে বাহির হইয়াছিল। তখন গুরুচরণের বাহিরের ঘরে প্রাত্যহিক চা-পানের সভা বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত হাসি এবং কথাবার্তা চলিতেছিল। তথাকার কোলাহল শেখরের কানে যাইবামাত্র সে একবার স্থির হইয়া কি ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া গুরুচরণের বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ কলরব থামিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

শেখর ফিরিয়া আসিয়াছিল এ সংবাদ ললিতা ছাড়া আর কেহ জানিত না। আজ গিরীন্দ্র এবং আরও একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিস্মিত-মুখে শেখরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং গিরীন মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। সর্বাপেক্ষা অধিক চেঁচাইতেছিলেন গুরুচরণ নিজে, তাঁহার মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাঁহার হাতের কাছে বসিয়া ললিতা তখনও চা তৈরি করিতেছিল, একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

শেখর সরিয়া আসিয়া তক্তপোশের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং একধারে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, এ কি, একেবারে সমস্ত নিবে গেল যে!

গুরুচরণ মৃদুকণ্ঠে বোধ করি আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন বোঝা গেল না।

তাঁহার মনের ভাব শেখর বুঝিল, তাই সময় দিবার জন্য নিজেই কথা পাড়িল। কাল সকালের গাড়িতে ফিরিয়া আসিবার কথা, জননীর রোগ উপশম হইবার কথা, পশ্চিমের কথা, আরও কত কি সংবাদ অনর্গল বকিয়া গিয়া শেষে সেই অপিরিচিত যুবকটির মুখের দিকে চাহিল।

গুরুচরণ এতক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিলেন, ছেলেটির পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের গিরীনের বন্ধু। এক জায়গায় বাড়ি, একত্রে লেখাপড়া শেখা, অতি সৎ ছেলে—শ্যামবাজারে থাকেন, তবুও আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্যন্ত প্রায়ই এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যান।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিল, হাঁ, খুব ভাল ছেলে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকা, আর সব খবর ভাল ত?

গুরুচরণ জবাব দিলেন না, মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শেখর উঠিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ কাঁদ–কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মাঝে মাঝে এসো বাবা, একেবারে যেন ত্যাগ করো না।সব কথা শুনেচ ত?

শুনেচি বৈ কি, বলিয়া শেখর অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

তার পরেই ভিতরে গৃহিণীর কান্নার শব্দ উঠিল, বাহিরে বসিয়া গুরুচরণ হেঁট মুখে কোঁচার খুঁট দিয়া নিজের চোখের জল মুছিতে লাগিলেন এবং গিরীন অপরাধীর মত মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ললিতা পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে শেখর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিতে গিয়া দেখিল, অন্ধকার কবাটের আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া আছে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া বুকের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া মুহূর্তকাল নিঃশব্দে কি যেন আশা করিয়া রহিল, তার পর পিছাইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?

কৈ, আমি ত চিঠি পাইনি—কি লিখেছিলে?

ললিতা বলিল, অনেক কথা। সে যাক। সব শুনেচ ত, এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল।

শেখর বিস্ময়ের স্বরে কহিল, আমার হুকুম! আমার হুকুমে কি হবে?

ললিতা শঙ্কিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তা বৈ কি ললিতা। আমি কার ওপর হুকুম দেব?

আমার ওপর, আর কার ওপর দিতে পারো?

তোমার ওপরেই বা দেব কেন? আর দিলেই বা তুমি শুনবে কেন? শেখরের কন্ঠস্বর গম্ভীর, ইষৎ করুণ।

এবার ললিতা মনে মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া, আর একবার কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিল যাও—এখন আমার তামাশা ভাল লাগছে না। পায়ে পড়ি, কি হবে বল? ভয়ে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না।

ভয় কিসের?

বেশ যা হোক। ভয় হবে না, তুমি কাছে নেই, মা কাছে নেই, মাঝে থেকে মামা কি-সব কাণ্ড করে বসলেন—এখন মা যদি আমাকে ঘরে নিতে না চান?

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে সত্যি, মা নিতে চাইবেন না। তোমার মামা অপরের কাছে অনেক টাকা নিয়েচেন, সে-কথা তিনি শুনেচেন। তা ছাড়া, এখন তোমরা ব্রাহ্ম, আমরা হিন্দু।

আন্নাকালী এইসময়ে রান্নাঘর হইতে ডাক দিল, সেজদি, মা ডাকচেন।

ললিতা চেঁচাইয়া বলিল, যাচ্ছি, তার পর গলা খাট করিয়া বলিল, মামা যাই হোন, তুমি যা, আমিও তাই। মা তোমাকে যদি ফেলতে না পারেন, আমাকেও ফেলবেন না। আর গিরীনবাবুর কাছে টাকা নেবার কথা বলচ—তা সে আমি ফিরিয়ে দেব। আর ঋণের টাকা, দু'দিন আগেই হোক, পিছনেই হোক, দিতেই তো হবে।

শেখর প্রশ্ন করিল, অত টাকা পাবে কোথায়?

ললিতা শেখরের মুখের পানে একটিবার চোখ তুলিয়া মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, জান না, মেয়েমানুষে কোথায় টাকা পায়? আমিও সেইখানে পাব।

এতক্ষণ শেখর সংযত হইয়া কথা কহিতে থাকিলেও ভিতরে পুড়িতেছিল, এবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার মামা তোমাকে বিক্রি করে ফেলেছেন যে!

ললিতা অন্ধকারে শেখরের মুখের ভাব দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন টের পাইল। সে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, ও-সব মিছে কথা। আমার মামার মত মানুষ সংসারে নেই—তাঁকে তুমি ঠাট্টা করো না। তাঁর দুঃখ-কষ্ট তুমি না জানতে পার, কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে, বলিয়া একবার ঢোক গিলিয়া, একবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, তা ছাড়া তিনি টাকা নিয়েচেন, আমার বিয়ে হবার পরে, সুতরাং আমাকে বিক্রি করবার অধিকার তাঁর নেই, বিক্রিও করেন নি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি, তুমি ইচ্ছে করলে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রি করে ফেলতে পার বটে!—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত শেখর বিহ্বলের মত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেছিল, সেদিনকার একফোঁটা ললিতা এত কথা শিখিল কিরূপে? এমন নির্লজ্জ মুখরার মত তাহার মুখের উপর কথা কহিল কি করিয়া?

আজ সে ললিতার ব্যবহারে সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, এই ক্রোধের যথার্থ হেতুটা কি, এ যদি শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত রাগ ললিতার উপরে নহে, তাহা সম্পূর্ণ নিজের উপরেই।

ললিতাকে ছাড়িয়া এই কয়টা মাসের প্রবাস-বাসকালে সে নিজের কল্পনায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া শুধু কাল্পনিক সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতিই খতাইয়া দেখিত। কিন্তু ললিতা আজ যে তাহার জীবনের কতখানি, ভবিষ্যতের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত, তাহার অবর্তমানে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন, কত দুঃখকর, বিছানায় শুইয়া এই কথাই সে বার বার আলোচনা করিতে লাগিল। ললিতা শিশুকাল হইতে নিজেদের সংসারে মিশিয়াছিল বলিয়াই

তাহাকে বিশেষ করিয়া আর সে সংসারের ভিতরে, বাপ-মা ভাই-বোনের মাঝখানে নামাইয়া আনিয়া দেখে নাই, দেখিবার কথাও মনে করে নাই। ললিতাকে হয়ত পাওয়া যাইবে না, পিতা-মাতা এ-বিবাহে সম্মতি দিবেন না, হয়ত সে অপর কাহারও হইবে,—দুশ্চিন্তা তাহার বরাবর এই ধার বহিয়াই চলিয়াছিল তাই বিদেশে যাইবার পূর্বের রাত্রে জোর করিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সে এইদিকের ভাঙ্গনটার মুখেই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিল।

প্রবাসে থাকিয়া গুরুচরণের ধর্মমত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া, শুনিয়া সে ব্যাকুল হইয়া অহর্নিশি এই চিন্তাই করিয়াছিল, পাছে ললিতাকে হারাইতে হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক, ভাবনার এই দিকটাই তাহার পরিচিত ছিল,

আজ ললিতার স্পষ্ট কথা এইদিকটা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবনার ধারা একেবারে উলটা স্রোতে বহাইয়া দিয়া গেল। তখন চিন্তা ছিল, পাছে না পাওয়া যায়, এখন ভাবনা হইল, পাছে না ছাড়া যায়।

শ্যামবাজারের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহারাও অত টাকা দিতে শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। শেখরের জননীরও মেয়েটি মনঃপূত হইল না। সুতরাং এই দায় হইতে শেখর আপাততঃ অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্ত নবীন রায় দশ-বিশ হাজারের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং সেপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়াও ছিলেন না।

শেখর ভাবিতেছিল, কি করা যায়। সে-রাত্রির সেই কাজটা যে এতবড় গুরুতর হইয়া উঠিবে, ললিতা যে এমন অসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহার সত্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মতঃ কোন কারণেই ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না, সেদিন এত কথা শেখর ভাবিয়া দেখে নাই। যদিও নিজের মুখেই উচ্চারণ করিয়াছিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন তুমিও ফিরাইতে পার না, আমিও না, কিন্তু তখন, আজ যেমন করিয়া সে সমস্তটা ভাবিয়া দেখিতেছে, তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার শক্তিও ছিল না, বোধ করি অবসরও ছিল না।

তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল প্রিয়তমার বক্ষস্পন্দন নিজের বুক পাতিয়া প্রথম অনুভবের মোহ ছিল, এবং প্রণয়ীরা যাহাকে অধরসুধা বলিয়াছেন, তাহাই পান করার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ এবং সাংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই, অর্থলোলুপ পিতার রুদ্রমূর্তি চোখের উপর জাগিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিল, মা ত ললিতাকে স্নেহ করেন, তখন তাঁহাকে সম্মত করানো কঠিন হইবে না, এবং দাদাকে দিয়া পিতাকে কোনমতে কোমল করিয়া আনিতে পারিলে শেষ পর্যন্ত হয়ত কাজটা হইয়াই যাইবে। তা ছাড়া গুরুচরণ এইভাবে তখন নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের আশার পথটা পাথর দিয়া এমনভাবে আঁটিয়া বন্ধ করেন নাই। এখন যে বিধাতাপুরুষ নিজে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছেন।

বস্তুত শেখরের চিন্তা করিবার বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। সে নিশ্চয় বুঝিতেছিল, পিতাকে সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, জননীকে সম্মত করানোও সম্ভব নহে। এ-কথা যে আর মুখে আনিবারও পথ নাই।

শেখর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার অস্ফুটে আবৃত্তি করিল, কি করা যায়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত, তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে—একবার যাহা সে নিজের ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোনমতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে, সে শেখরের ধর্মপত্নী, তাই আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অসঙ্কোচে বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ তুলিয়া অমন করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

গিরীনের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা শুরু হইয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাকে ত সম্মত করাইতে পারিবে না। আর ত সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। শেখরের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সত্যই ত! সে ত শুধু মালা-বদল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিল। ললিতা বাধা দেয় নাই—দোষ নাই বলিয়াই দেয় নাই—ইহাতে তাহার অধিকার আছে বলিয়াই দেয় নাই, এখন এই ব্যবহারের জবাব সে কার কাছে কি দিবে?

পিতামাতার অমতে ললিতার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু গিরীনের সহিত ললিতার বিবাহ না হইবার হেতু প্রকাশ পাইবার পর ঘরে-বাহিরে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দশম পরিচ্ছেদ

অসম্ভব বলিয়া শেখর ললিতার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম ক'টা দিন সে মনে মনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে হঠাৎ সে আসিয়া উপস্থিত হয়, পাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, পাছে এই সব লইয়া লোকের কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু কেহই তাহার কৈফিয়ত চাহিল না, কোন কথা প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিংবা সে-বাড়ি হইতে এ-বাড়িতে কেহ আসা-যাওয়া পর্যন্ত করিল না। শেখরের ঘরের সম্মুখে যে খোলা ছাদটা ছিল, তাহার উপরে দাঁড়াইলে ললিতাদের ছাদের সবটুকু দেখা যাইত; পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে সে এই ছাদটায় পর্যন্ত দাঁড়াইত না। কিন্তু যখন নির্বিঘ্নে একমাস কাটিয়া গেল, তখন সে নি:শ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, হাজার হোক মেয়েমানুষের লজ্জাশরম আছে, এ-সকল ব্যাপার সে প্রকাশ করিতেই পারে না। সে শুনিয়াছিল, ইহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চাহে না, এ-কথা সে বিশ্বাস করিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাহাদের দেহে এই দুর্বলতা দিয়াছেন বলিয়া সে মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিল। অথচ শান্তি পাওয়া যায় না কেন? যখন হইতে সে বুঝিল আর ভয় নাই, তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব ব্যথায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন? তবে ত ললিতা কোন কথাই বলিবে না—আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় পর্যন্ত মৌন হইয়া থাকিবে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে-বাহিরে তাহার এমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন?

পূর্বে সে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির না হইয়া সুমুখের খোলা ছাদটার উপর পদচারণা করিত, আজও তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু একটি দিনও ও-

বাড়ির কাহাকেও ছাদে দেখিতে পাইল না। শুধু একদিন আন্নাকালী কি করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চোখ নামাইয়া ফেলিল এবং শেখর তাহাকে ডাকিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। শেখর মনে মনে বুঝিল, তাহারা যে পথ বন্ধ করিয়া প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, ইহার অর্থ ঐ একফোঁটা কালী পর্যন্ত জানিয়াছে।

আরও একমাস গত হইল।

একদিন ভুবনেশ্বরী কথায় কথায় বলিলেন, এর মধ্যে তুই ললিতাটাকে দেখেচিস শেখর?

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কেন?

মা বলিলেন, প্রায় দু'মাস পরে কাল তাকে ছাদে পেয়ে ডাকলুম—মেয়েটা আমার যেন আর-এক রকমের হয়ে গেছে। রোগা, মুখখানি শুকনো, যেন কত বয়স হয়েচে। এমনি গম্ভীর, কার সাধ্যি দেখে বলে চোদ্দ বছরের মেয়ে—তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ভারী গলায় বলিলেন, পরনের কাপড়খানি ময়লা, আঁচলের কাছে খানিকটা সেলাই-করা। জিজ্ঞেস করলুম, তোর কাপড় নেই মা? বললে ত আছে, কিন্তু, বিশ্বাস হয় না। কোনদিনই সে ওর মামার দেওয়া কাপড় পরে না, আমিই দিই, আমিও ত ছ-সাত মাস কিছু দিইনি। তিনি আর বলিতে পারিলেন না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন—ললিতাকে যথার্থই তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসিতেন।

শেখর আর-এক দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আমি ছাড়া কোনদিন সে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না। অসময়ে খিদে পেলেও বাড়িতে মুখ ফুটে বলতেও পারে না,—সেও আমি—ঐ আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতো—আমি তার মুখ দেখলেই টের পেতুম। আমার সেই কথাই মনে হয় শেখর, হয়ত মুখ শুকিয়ে

শুকিয়ে বেড়ায়, কেউ তাকে বোঝেও না, জিজ্ঞেসও করে না। আমাকে ত শুধু সে মা বলেই ডাকে না, মায়ের মত ভালও বাসে যে।

শেখর সাহস করিয়া মায়ের মুখের দিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না। যেদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চাহিয়া থাকিয়াই কহিল, বেশ ত মা, কি তার দরকার ডেকে জিজ্ঞেস করে দাও না কেন?

নেবে কেন? উনি যাওয়া-আসার পথটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আমিই বা দিতে যাবো কোন মুখে? ঠাকুরপো দুঃখের জ্বালায় না বুঝে যেন একটা অন্যায় করেচেন, আমরা আপনার লোকের মত কোথায় একটা প্রায়শ্চিত্ত-ট্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ঢেকে দেব, তা নয়, একেবারে পর করে দিলুম। আর তাও বলি, এঁর পীড়াপীড়িতেই সে জাত দিয়ে ফেলেছে। কেবল তাগাদা, কেবল তাগাদা—মনের ঘেন্নায় মানুষ সব করতে পারে। বরং আমি ত বলি, ঠাকুরপো ভালই করেছেন। ঐ গিরীন ছেলেটি আমাদের চেয়ে তাঁর ঢের বেশি আপনার, তার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটা সুখে থাকবে তা আমি বলচি। শুনচি, আসচে মাসেই হবে।

হঠাৎ শেখর মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আসচে মাসেই হবে নাকি?

তাই ত শুনি।

শেখর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ললিতার মুখে শুনলাম, ওর মামার দেহটাও নাকি আজকাল ভাল নেই। না থাকবারই কথা। একে তার নিজের মনের সুখ নেই, তাতে বাড়িতে নিত্য কান্নাকাটি—এক মিনিটের তরেও ও-বাড়িতে স্বস্তি নেই।

শেখর চুপ করিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল—সে ললিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

এই গলিটায় দু’খানা গাড়ির স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের স্থান হয় না। একখানা গাড়ি খুব একপাশে ঘেঁষিয়া না দাঁড়াইলে আর একটা যাইতে পারে না। দিন-দশেক পরে শেখরের অফিস-গাড়ি গুরুচরণের বাটীর সুমুখে বাধা পাইয়া স্থির হইল। শেখর অফিস হইতে ফিরিতেছিল, নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ডাক্তার আসিয়াছেন।

সে কিছুদিন পূর্বে মায়ের কাছে শুনিয়াছিল গুরুচরণের শরীর ভাল নাই। তাই মনে করিয়া আর বাড়ি গেল না, সোজা গুরুচরণের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই বটে। গুরুচরণ নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, একপাশে ললিতা এবং গিরীন শুষ্কমুখে বসিয়া আছে, সুমুখে চৌকির উপর বসিয়া ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিতেছেন।

গুরুচরণ অস্ফুট-স্বরে বসিতে বলিলেন, ললিতা মাথায় আঁচলটা আরো একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ডাক্তার পাড়ার লোক, শেখরকে চিনিতেন। রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। গিরীন পিছনে আসিয়া টাকা দিয়া ডাক্তার বিদায় করিবার সময়, তিনি বিশেষ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, রোগ এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এই সময়ে বায়ু-পরিবর্তনের নিতান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার চলিয়া গেলে উভয়েই আর একবার গুরুচরণের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ললিতা ইশারা করিয়া গিরীনকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল, শেখর সুমুখের চৌকিতে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া গুরুচরণের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ইতিপূর্বে ওদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন, শেখরের পুনরাগমন জানিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেখর উঠিয়া গেল, তখনও ললিতা ও গিরীন তেমনি চুপি চুপি কথাবার্তা কহিতেছিল, তাহাকে কেহ বসিতে বলিল না, আসিতে বলিল না, একটা কথা পর্যন্ত কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না।

আজ সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিল, ললিতা তাহাকে তাহার কঠিন দায় হইতে চিরদিনের মত মুক্তি দিয়াছে—এখন সে নির্ভয়ে হাঁফ ফেলিয়া বাঁচুক—আর শঙ্কা নাই, আর ললিতা তাহাকে জড়াইবে না! ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সহস্রবার মনে পড়িল, আজ সে নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে গিরীনই ও-বাড়ির পরম বন্ধু, সকলের আশা-ভরসা এবং ললিতার ভবিষ্যতের আশ্রয়। সে কেহ নহে, এমন বিপদের দিনেও ললিতা তাহার একটি মুখের পরামর্শেরও আর প্রত্যাশী নহে।

সে সহসা 'উঃ'—বলিয়া একটা গদীআঁটা আরাম-চৌকির উপর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। ললিতা তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল, যেন সম্পূর্ণ পর—একেবারে অপরিচিত! আবার তাহারই চোখের সুমুখে গিরীনকে আড়ালে ডাকিয়া কত-না পরামর্শ! অথচ এই লোকটিরই অভিভাবকতায় একদিন তাকেই থিয়েটার দেখিতে পর্যন্ত যাইতে দেয় নাই।

এখনও একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত সে তাহাদের গোপন সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়াই লজ্জায় ওরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাই বা কি করিয়া সম্ভব? তাহা হইলে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, অথচ একটি কথাও কি সে এতদিনের মধ্যে কোন কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিত না?

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন, কৈ রে, এখনও হাতমুখ ধুসনি—সন্ধ্যা হয় যে!

শেখর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাহার মুখের উপর মায়ের দৃষ্টি না পড়ে, এইভাবে ঘাড় ফিরাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

এই কয়টা দিন অনেক কথাই অনেক রকমের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ আনাগোনা করিয়াছে, শুধু একটা কথা সে ভাবিয়া দেখিত না, বস্তুত দোষ কোনদিকে। একটি আশার কথা সে আজ পর্যন্ত তাহাকে বলে নাই, কিংবা তাহাকে বলিবারও সুযোগ দেয় নাই। বরঞ্চ, পাছে প্রকাশ পায়, সে কোনরূপ দাবি করিয়া বসে, এই ভয়ে কাঠ হইয়া ছিল। তথাপি, সর্বপ্রকারের অপরাধ একা ললিতার মাথায় তুলিয়া দিয়াই সে তাহার বিচার করিতেছিল এবং নিজের হিংসায়, ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে পুড়িয়া মরিতেছিল। বোধ করি, এমনি করিয়াই সংসারের সকল পুরুষ বিচার করে এবং এমনি করিয়াই দগ্ধ হয়।

পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সাত দিন কাটিয়াছে, আজও সন্ধ্যার পর নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াই বসিয়াছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই তাহার হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল! কালীর হাত ধরিয়া ললিতা ঘরে ঢুকিয়া নীচে কার্পেটের উপর স্থির হইয়া বসিল। কালী বলিল, শেখরদা, আমরা দু'জনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেচি—কাল আমরা চলে যাব।

শেখর কথা কহিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

কালী বলিল, অনেক দোষ-অপরাধ তোমার পায়ে আমরা করেচি শেখরদা, সে-সব ভুলে যেয়ো।

শেখর বুঝিল, ইহার একটি কথাও কালীর নিজের নহে, সে শেখানো কথা বলিতেছে মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, কাল কোথায় যাবে তোমরা?

পশ্চিমে। বাবাকে নিয়ে আমরা সবাই মুঙ্গের যাব—সেখানে গিরীনবাবুর বাড়ি আছে। তিনি ভাল হলেও আর আমাদের আসা হবে না, ডাক্তার বলেছেন, এ-দেশ বাবার সহ্য হবে না।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

একটু ভাল, বলিয়া কালী আঁচলের ভিতর হইতে কয়েক জোড়া কাপড় বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, জ্যাঠাইমা আমাদের কিনে দিয়েচেন।

ললিতা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর একটি চাবি রাখিয়া দিয়া বলিল, আলমারির এই চাবিটা এতদিন আমার কাছেই ছিল, একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু টাকাকড়ি ওতে আর নেই, সমস্ত খরচ হয়ে গেছে।

শেখর চুপ করিয়া রহিল।

কালী বলিল, চল সেজদি, রাত্তির হচ্ছে।

ললিতা কিছু বলিবার পূর্বেই এবার শেখর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, কালী, নীচে থেকে আমার জন্যে দুটো পান নিয়ে এস ত ভাই।

ললিতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুই বোস কালী, আমি এনে দিচ্ছি, বলিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। খানিক পরে পান আনিয়া কালীর হাতে দিল, সে শেখরকে দিয়া আসিল।

পান হাতে লইয়া শেখর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

চললুম শেখরদা, বলিয়া কালী পায়ের কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। ললিতা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শেখর তাহার ভালমন্দ ও আত্মমর্যাদা লইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুরমুখে বিহ্বল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে আসিল, যাহা বলিবার ছিল বলিয়া চিরদিনের মত বিদায় লইয়া গেল, কিন্তু শেখরের কিছুই বলা হইল না। যেন, বলিবার কথা তাহার ছিল না, এইভাবে সমস্ত সময়টুকু কাটিয়া গেল। ললিতা কালীকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছিল; কারণ, সে চাহে না কোন কথা উঠে, ইহাও সে মনে মনে বুঝিল। তাহার পরে, তাহার সর্বশরীর ঝিমঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে উঠিয়া গিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুরুচরণের ভাঙ্গা দেহ মুঙ্গেরের জলহাওয়াতেও আর জোড়া লাগিল না। বৎসর-খানেক পরেই তিনি দুঃখের বোঝা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গিরীন যথার্থই তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিল এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাহার যথাসাধ্য করিয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি সজল-কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে যেন কোনদিন পর না হইয়া যায় এবং এই গভীর বন্ধুত্ব যেন নিকট আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি ইহা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, অসুখ-বিসুখে সময় হইল না, কিন্তু পরলোকে বসিয়া যেন দেখিতে পান। গিরীন তখন সানন্দে এবং সর্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

গুরুচরণের কলিকাতার বাটীতে যে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহার মুখে ভুবনেশ্বরী মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতেন, গুরুচরণের মৃত্যুসংবাদ তাহারাই দিয়াছিল।

তাহার পর এ-বাড়িতে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। নবীন রায় হঠাৎ মারা গেলেন।

ভুবনেশ্বরী শোকে-দুঃখে পাগলের মত হইয়া বড়বধূর হাতে সংসার সঁপিয়া দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আগামী বৎসর শেখরের বিয়ের সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে তিনি আসিয়া বিবাহ দিয়া যাইবেন।

বিবাহের সম্বন্ধ নবীন রায় নিজেই স্থির করিয়াছিলেন। এবং পূর্বেই হইয়া যাইত, শুধু তাঁহার মৃত্যু হওয়াতেই এক বৎসর স্থগিত ছিল। কন্যাপক্ষের আর বিলম্ব করা চলে না, তাই তাহারা কাল আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিল। এই মাসেই বিবাহ। আজ শেখর জননীকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

আলমারি হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া তোরঙ্গ সাজাইতে গিয়া অনেকদিন পরে তাহার ললিতার কথা মনে পড়িল—সব সে-ই করিত।

তিন বৎসরের অধিক হইল তাহারা চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদই সে জানে না। জানিবার চেষ্টাও করে নাই, বোধ করি, ইচ্ছাও ছিল না। ললিতার উপরে ক্রমশঃ তাহার একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সহসা ইচ্ছা করিল, যদি কোনমতে একটা খবর পাওয়া যায়—কে কেমন আছে। অবশ্য ভাল থাকিবারই কথা, কারণ গিরীনের সঙ্গতি আছে, তাহা সে জানিত, তথাপি সে শুনিতে ইচ্ছা করে, কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহার কাছে কেমন আছে—এই সব।

ও-বাড়ির ভাড়াটিয়ারাও আর নাই, মাস-দুই হইল বাড়ি খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শেখর একবার ভাবিল, চারুর বাপকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কারণ তাঁহারা গিরীনের সংবাদ নিশ্চয় রাখেন। ক্ষণকালের জন্য তোরঙ্গ গুছানো স্থগিত রাখিয়া সে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া এই সব ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পুরাতন দাসী কহিল, ছোটবাবু, কালীর মা একবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শেখর মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, কোন্ কালীর মা?

দাসী হাত দিয়া গুরুচরণের বাড়িটা দেখাইয়া বলিল, আমাদের কালীর মা ছোটবাবু, তাঁরা কাল রাত্তিরে ফিরে এসচেন যে।

চল যাচ্চি, বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, সে বাড়িতে পা দিতেই বুকভাঙ্গা কান্নার রোল উঠিল। বিধবা-বেশধারিণী গুরুচরণের স্ত্রীর কাছে গিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং কোঁচার খুঁট দিয়া নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল। শুধু গুরুচরণের জন্য নহে, সে নিজের পিতার শোকেও আর একবার অভিভূত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইলে ললিতা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শেখর সপ্তদশবর্ষীয়া পরস্ত্রীর পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে বা ডাকিয়া কথা কহিতে পারিল না। তথাপি আড়চোখে যতটা সে দেখিতে পাইয়াছিল, মনে হইল, ললিতা যেন আরও বড় হইয়াছে এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

অনেক কান্নাকাটির পরে গুরুচরণের বিধবা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, এই বাড়িটা তিনি বিক্রয় করিয়া মুঙ্গেরে জামাইয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। বাড়িটা বহুদিন হইতে শেখরের পিতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারাই ক্রয় করিলে ইহা একরকম নিজেদেরই থাকিবে, তাহার নিজেরও কোনরূপ ক্লেশ বোধ হইবে না এবং ভবিষ্যতে কখন তিনি এদেশে আসিলে, দুই-একদিন বাস করিয়া যাইতেও পারিবেন—এই-সব। শেখর, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার যথাসাধ্য করিবে বলায় তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন, দিদি কি এর মধ্যে আসবেন না শেখর?

শেখর জানাইল, আজ রাত্রেই তাঁকে সে আনিতে যাইবে। অতঃপর তিনি একটি একটি করিয়া অন্যান্য সংবাদ জানিয়া লইলেন—শেখরের কবে বিবাহ, কোথায়, কত হাজার, কত অলঙ্কার, নবীন রায় কি করিয়া মারা গেলেন, দিদি কি করিলেন ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন এবং শুনিলেন।

শেখর যখন ছুটি পাইল, তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। এই সময় গিরীন্দ্র উপর হইতে নামিয়া বোধ করি তাহার দিদির বাটীতে গেল। গুরুচরণের বিধবা দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই শেখরনাথ? এমন ছেলে সংসারে আর হয় না।

শেখরের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহা সে জানাইল এবং আলাপ আছে বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাহিরের বসিবার ঘরের সুমুখে আসিয়া তাহাকে সহসা থামিতে হইল।

অন্ধকার দরজার আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, শোনো, মাকে কি আজই আনতে যাবে?

শেখর বলিল, হাঁ।

তিনি কি বড় বেশি কাতর হয়ে পড়েচেন?

হাঁ, প্রায় পাগলের মত হয়েছিলেন।

তোমার শরীর কেমন আছে?

ভাল আছে, বলিয়া শেখর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া তাহার আপাদমস্তক লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। ললিতার কাছাকাছি দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নিজের দেহটাও যেন অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, এমনি মনে হইতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে যেমন-তেমন করিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তখনও গাড়ির বিলম্ব আছে জানিয়া, আর একবার শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে শপথ করিয়া সে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার দাবানল জ্বালিয়া দিল। দাহনের যাতনায় সে তাহাকে মনে মনে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিল, এমন কি, কুলটা পর্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ করিল না। তখন কথায় কথায় গুরুচরণের স্ত্রী বলিয়াছিলেন, এ ত সুখের বিয়ে নয়, তাই শেষ পর্যন্ত কারো মনে ছিল না, নইলে ললিতা তখন তোমাদের সকলকেই সংবাদ দিতে বলেছিল। ললিতার এই স্পর্ধাটা যেন সমস্ত আগুনের উপরেও শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেখর মাকে লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার বিবাহের দশ-বারো দিন বিলম্ব ছিল।

দিন-তিনেক পরে, একদিন সকালে ললিতা শেখরের মায়ের কাছে বসিয়া একটা ডালায় কি কতকগুলো তুলিতেছিল। শেখর জানিত না, তাই কি একটা কাজে 'মা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। ললিতা মুখ নীচু করিয়া কাজ করিতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে?

সে যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া, না, এখন থাক, বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ললিতার মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার হাত দুইটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহা সম্পূর্ণ নিরাভরণ না হইলেও দু'গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। শেখর মনে মনে ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল, এ আর এক রকমের ভড়ং। গিরীন সঙ্গতিপন্ন তাহা সে জানিত, তাহার পত্নীর হাত এরূপ অলঙ্কারশূন্য হইবার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতেছিল, ললিতাও সেই সিঁড়িতে উপরে উঠিতেছিল, একপাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শেখর নিকটে আসিতেই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একটা কথা বলবার আছে।

শেখর একমুহূর্ত স্থির হইয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল, কাকে? আমাকে?

ললিতা তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, হাঁ তোমাকে।

আমার সঙ্গে আবার কি কথা! বলিয়া শেখর পূর্বাপক্ষো দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে শেখর তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া সেইদিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিল, নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত চোখ তুলিয়া দেখিল, গিরীন প্রবেশ করিতেছে। গিরীন নমস্কার করিয়া নিকটে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। শেখর প্রতি-নমস্কার করিয়া সংবাদপত্রটা একপাশে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চোখের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু, আলাপ ছিল না এবং সে-পক্ষে আজ পর্যন্ত দু'জনের কেহই কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

গিরীন একেবারেই কাজের কথা পাড়িল। বলিল, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেচি। আমার শাশুড়িঠাকরুনের অভিপ্রায় আপনি শুনেচেন—বাড়িটা তিনি আপনাদের কাছে বিক্রি করে ফেলতে চান। আজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, শীঘ্র যা হোক একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই তাঁরা এই মাসেই মুঙ্গেরে ফিরে যেতে পারেন।

গিরীনকে দেখিবামাত্রই শেখরের বুকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছিল, কথাগুলা তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগিল না, অপ্রসন্ন-মুখে বলিল, সে ত ঠিক কথা, কিন্তু বাবার অবর্তমানে দাদাই এখন মালিক, তাঁকে বলা আবশ্যক।

গিরীন মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আমরাও জানি। কিন্তু তাঁকে আপনি বললেই ত ভাল হয়।

শেখর তেমনিভাবেই জবাব দিল, আপনি বললেও হতে পারে। ও-পক্ষের অভিভাবক এখন আপনিই।

গিরীন কহিল, আমার বলবার আবশ্যক হলে বলতে পারি; কিন্তু কাল সেজদি বলছিলেন, আপনি একটু মনোযোগ করলে অতি সহজেই হতে পারে।

শেখর মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে বললেন?

গিরীন বলিল,—সেজদি—ললিতাদিদি বলছিলেন—শেখর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তার পরে গিরীন কি যে বলিয়া গেল, তাহার একবিন্দুও তাহার কানে গেল না। খানিকক্ষণ বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন গিরীনবাবু, কিন্তু ললিতার সঙ্গে কি আপনার বিবাহ হয়নি?

গিরীন জিব কাটিয়া বলিল, আজ্ঞে, না—ওদের সকলকেই আপনি জানেন—কালীর সঙ্গে আমার—

কিন্তু, সে-রকম ত কথা ছিল না।

গিরীন ললিতার মুখে সব কথাই শুনিয়াছিল, কহিল, না, কথা ছিল না, সে-কথা সত্য। গুরুচরণবাবু মৃত্যুকালে আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন আমি আর কোথাও যেন বিবাহ না করি। আমিও প্রতিশ্রুত হই। তাঁর মৃত্যুর পরে সেজদিদি আমাকে বুঝিয়া বলেন, অবশ্য, এ-সব কথা আর কেউ জানে না যে, ইতিপূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত আছেন। এ-কথা আর কেউ হয়ত বিশ্বাস করত না, কিন্তু আমি তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করিনি। তা ছাড়া, স্ত্রীলোকের একবারের অধিক বিবাহ হতে পারে না—ও কি?

শেখরের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সেই বাষ্প অশ্রুধারায় চোখের কোণ বহিয়া গিরীনের সম্মুখেই ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে তাহার চৈতন্য ছিল না, তাহার মনেও পড়িল না, পুরুষের সম্মুখেই পুরুষের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর।

গিরীন নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে মনে সন্দেহ ছিলই—আজ সে ললিতার স্বামীকে নিশ্চয় চিনিতে পারিল। শেখর চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল, কিন্তু আপনি ত ললিতাকে স্নেহ করেন?

গিরীনের মুখের উপরে প্রচ্ছন্ন বেদনার গাঢ় ছায়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল, সে কথার জবাব দেওয়া

আনাবশ্যক। তা ছাড়া, স্নেহ যত বড়ই হোক, জেনে-শুনে কেউ পরের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করে না—যাক, গুরুজনের সম্বন্ধে ও-সব আলোচনা আমি করতে চাইনে, বলিয়া সে আর একবার হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ যাই, আবার অন্য সময় দেখা হবে, বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

গিরীনকে শেখর চিরদিনই মনে মনে বিদ্বেষ করিয়াছে, এইবারে সেই বিদ্বেষ নিবিড় ঘৃণায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ সে চলিয়া যাইবামাত্র শেখর উঠিয়া আসিয়া ভূমিতলে বারংবার মাথা ঠেকাইয়া এই অপরিচিত ব্রাহ্ম-যুবকটির উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মানুষ নিঃশব্দে যে কতবড় স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, হাসিমুখে কি কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে তাহা আজ সে প্রথম দেখিল।

অপরাহ্নবেলায় ভুবনেশ্বরী নিজের ঘরে মেঝেয় বসিয়া ললিতার সাহায্যে নূতন বস্ত্রের রাশি থাক দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, শেখর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের শয্যার উপর গিয়া বসিল! আজ সে ললিতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পলাইল না। মা চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, কি রে!

শেখর জবাব দিল না, চুপ করিয়া থাক দেওয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, ও কি হচ্ছে মা?

মা বলিলেন, নূতন কাপড় কাকে কি-রকম দিতে হবে, হিসেব করে দেখচি—বোধ করি, আরও কিছু কিনতে হবে, না, মা?

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

শেখর হাসি-মুখে কহিল, আর যদি বিয়ে না করি মা?

ভুবনেশ্বরী হাসিলেন। বলিলেন, তা তুমি পারো, তোমার গুণে ঘাট নেই।

শেখরও হাসিয়া বলিল, তাই বোধ করি হয়ে দাঁড়ায় মা।

মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ও কি কথা! অমন অলক্ষণে কথা মুখে আনিস নে।

শেখর বলিল, এতদিন মুখে ত আনিনি মা, কিন্তু আর না আনলে নয়—আর চুপ করে থাকলে মহাপাতক হবে মা।

ভুবনেশ্বরী বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত-মুখে চাহিয়া রহিলেন।

শেখর বলিল, তোমার এই ছেলেটির অনেক অপরাধই তুমি ক্ষমা করে এসেচ, এটাও ক্ষমা কর মা, আমি সত্যই এ বিয়ে করতে পারব না।

পুত্রের কথা ও মুখের ভাব দেখিয়া ভুবনেশ্বরী সত্যই উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন যা তুই এখান থেকে, আমাকে জ্বালাতন করিস নে শেখর—আমার অনেক কাজ।

শেখর আর একবার হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, না মা, সত্যিই বলচি তোমাকে, এ বিয়ে হতে পারবে না।

কেন, এ কি ছেলেখেলা?

ছেলেখেলা নয় বলেই ত বলচি মা।

ভুবনেশ্বরী এবার রীতিমত ভীত হইয়া সরোষে বলিলেন, কি হয়েচে আমাকে বুঝিয়ে বল শেখর। ও-সব গোলমেলে কথা আমার ভাল লাগে না।

শেখর মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো মা, আর একদিন বলবো।

আর একদিন বলবি! তিনি কাপড়ের গোছা একধারে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তবে আজই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এমন সংসারে আমি একটা রাতও কাটাতে চাইনে।

শেখর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী অধিকতর অস্থির হইয়া বলিলেন, ললিতাও আমার সঙ্গে কাশী যেতে চায়, দেখি তার যদি একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে পারি।

এবার শেখর মুখ তুলিয়া হাসিল, তুমি নিয়ে যাবে, তার আবার বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করবে মা? তোমার হুকুমের বড় ওর আবার কি আছে!

>ছেলের হাসিমুখ দেখিয়া তিনি মনে মনে একটু যেন আশান্বিতা হইলেন, ললিতার পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, শুনলি মা ওর কথা! ও মনে করে, আমি ইচ্ছা করলেই যেন যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি! ওর মামীর মত নিতে হবে না?

ললিতা জবাব দিল না। শেখরের কথাবার্তার ধরনে সে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

শেখর বলিয়া ফেলিল, তাঁকে জানাতে চাও, জানাও গে, সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু তুমি যা বলবে তাই হবে মা, এ আমিও মনে করি, যাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, সেও মনে করে, ও তোমার পুত্রবধূ। বলিয়া ফেলিয়াই শেখর ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জননীর সম্মুখে সন্তানের মুখে এ কি পরিহাস! একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বললি? ও আমার কি?

শেখর মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল। আস্তে আস্তে বলিল, ঐ ত বললুম মা। আজ নয়, চার বৎসরের বেশি হ'লো, তুমি সত্যই ওর মা। আমি আর বলতে পারিনে মা, ওকে জিজ্ঞেস কর ও-ই বলবে,—বলিয়াই দেখিল ললিতা গলায় আঁচল দিয়া মাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেও উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল, এবং উভয়ে একত্রে মায়ের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া শেখর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ভুবনেশ্বরীর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ললিতাকে সত্যই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সিন্দুক খুলিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহাকে পরাইতে পরাইতে একটু একটু করিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তাই বুঝি গিরীনের কালীর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে?

ললিতা বলিল, হ্যাঁ মা, তাই। গিরীনবাবুর মত মানুষ সংসারে আর আছে কিনা জানি না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতেই, তিনি বিশ্বাস করলেন যে সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন, না করুন, সে তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু তিনি আছেন।

ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি মা! আশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুক, একটু বোস মা, আমি অবিনাশকে জানিয়ে আসি যে, বিয়ের কনে বদল হয়ে গেছে, বলিয়া হাসিয়া বড়ছেলের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।